# বিপ্লবের রূপরেখা

মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন যায়দান

# বিপ্লবের রূপরেখা

মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন যায়দান

(বিপ্লবী বক্তৃতা পর্ব - ০১)

অনুবাদ ও পরিবেশনা

# সূচিপত্র

বিপ্লব কাকে বলে? .....৫

পূর্বের সংজ্ঞায় ছয়টি মৌলিক উপাদান লক্ষ্যণীয়: .....৫

১-আমূল পরিবর্তন: .....৫

২- হিসাব-নিকাশ: .....৬

৩-সহিংসতা: .....৬

৪-নির্মাণ: .....৭

৫-সংস্কার: .....৭

৬-নিরাপত্তা বিধান: .....৮

বিপ্লব প্রাদুর্ভাবের কারণসমূহ: .....৯

১-শাসকশ্রেণী নিচের যে কোন অবস্থার মাঝে এক ঘরে হয়ে যাবে: .....৯

রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংসের কারণসমূহ: .....৯

১-অর্থনৈতিক সঙ্কট: .....১০

২-যৌথ বিস্ফোরণ: .....১০

৩-বিভিন্ন যুদ্ধ ও যুদ্ধে পরাজয়সমুহ: .....১০

৪-বহির্বিশ্বের চাপ: .....১১

৫- আকিদা-বিশ্বাস এবং পবিত্র বিষয়গুলো নিয়ে তামাশা করা: .....১১

বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বা মতাদর্শ: .....১২

বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নিম্নরুপ: .....১২

বৈপ্লবিক পদযাত্রার স্তরসমূহ .....১৩

১-সূচনা এবং প্রস্তুতির স্তর: .....১৩

ক. বিপ্লবের বীজ রোপন করা। .....১৩

খ. ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে করণীয় নির্ধারণ করা: .....১৩

২-পূর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস করার স্তর: .....১৪

প্রথমত: নিরাপত্তাকর্মী এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর-পাকড়: .....১৪

নির্যাতনকারী বাহিনীর মোকাবেলা করা: .....১৫

দ্বিতীয়ত: জনশক্তি তৈরী এবং তাদের মধ্য থেকে সেনা সমাবেশের ধারা অব্যহত রাখা: .....১৬

তৃতীয়ত: সময়: ১৭
চতুর্থত: সামাজিক সংহতি: ১৮
৩-নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ: ১৯
আরব বিপ্লবের কিছু সমালোচনা: ২০
বিপ্লবের পক্ষ ও বিপক্ষ: ২১
আন্দোলনের নেতৃত্ব: ২১
বিপ্লবে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণসমূহ: ২৩
বিপ্লবে সফল হওয়ার উপাদানসমূহ: ২৩
বিপ্লবে ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ: ২৩
বিপ্লব সংক্রমণ ২৪
বিপ্লব সংক্রমণের প্রতিরোধ করা: ২৪
উপসংহার: ২৫
মিসর বিপ্লবের পর্যালোচনা : ২৫

## বিপ্লব কাকে বলে?

শাসকশ্রেণী ও তাদের সকল প্রতিষ্ঠান এবং আর্থিকব্যবস্থা পতনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শাসনব্যবস্থার মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে কোন জাতির আন্দোলনকে الثورة তথা বিপ্লব বলা হয়। এটি শান্তিপূর্ণ এবং সহিংস উপায়ে বাস্তবায়ন। অতঃপর পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থলে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপন এবং নতুন সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশ নির্মার্ণ। জনগণের আশানুরূপ ও তাদের দাবী পূরণ করতে পারবে, এমন প্রত্যাশিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। বিপ্লবের চেতনা সংরক্ষণ এবং নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার পদযাত্রাকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ প্রস্তুতকরণ।

**বিপ্লব হচ্ছে:** আগত প্রজন্মগুলোর সম্মান ও মর্যাদার জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি প্রজন্মকে কুরবানী পেশ করা। 'কুরবানী ও উৎসর্গ' এ দু'টি শব্দ হচ্ছে: কোন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের জন্য যে কোন আন্দোলনের মূল উপাদান।

এমনিভাবে বিপ্লব কোন অসহনীয় নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য সূচিত হয়। (চাই এ নিপীড়ন হোক- আকিদাগত, নিরাপত্তামূলক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক অথবা সরাসরি ঔপনিবেশিকদের নিপীড়ন অথবা তাদের নিয়োগকৃত প্রতিনিধিদের নিপীড়ন।) ঔপনিবেশিকদের নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে এবং আরো উন্নত জীবন গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও সুশৃঙ্খল গণ-আন্দোলন জরুরী, সশস্ত্র অবস্থায় হোক বা নিরস্ত্র অবস্থায়।

## পূর্বের সংজ্ঞায় ছয়টি মৌলিক উপাদান লক্ষ্যণীয়:

"المنظم/সুশৃঙ্খল" শব্দটি দ্বারা বুঝা যায় বিপ্লবের জন্য একটি তানজীম, জামাত বা দল আবশ্যক। যা জাতির উত্থানে প্রধান নেতৃত্বে থাকবে। মানবিক ও মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জাতিকে জাগ্রত করতে সে তানজীমের রাজনৈতিক ও দাবীমূলক তৎপরতার অনুশীলন থাকবে। যেই মুহূর্তে জনগণ বিস্ফোরণ ও ময়দানে নামার অবস্থায় পৌঁছাবে, সেই মুহূর্তে এ তানজীম বা সংগঠন বিপ্লবের নেতৃত্ব দিবে, বিপ্লব ও বিপ্লবীদের শত্রুর আক্রমণ থেকে পাহারা দিবে। সমাবেশের ব্যবস্থা করবে এবং মাঠ পর্যায়ে নেতৃত্ব নিশ্চিত করবে। তারা নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না পূর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

## ১-আমূল পরিবর্তন:

**এ শব্দটিকে কেন্দ্র করে পাঠকের জন্য তিনটি পয়েন্ট তুলে ধরা হলো-**

**এক:** পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি কর্মপদ্ধতি ও কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, যেগুলো জনগণের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে কিংবা তাদের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। অথবা সেটি এমন এক ব্যবস্থা ছিল, যা এক শ্রেণীর সেবা করত আর অবশিষ্ট জনগণকে দাস বানিয়ে রাখত এবং তাদের অধিকার হরণ করত। অথবা এমন রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল, যা সম্পদ ও ক্ষমতার একচেটিয়া ব্যবহার করত। অপরদিকে জনগণ জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটাতে হাঁপিয়ে উঠত। আর রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠিত হয়; নেতৃত্ব, তার দল আমলাতন্ত্র জোট ও সহযোগী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা। চাই সে প্রতিষ্ঠান ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক হোক না কেন।

**দুই:** সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নতুন নতুন প্রোগ্রামের আয়োজন করা। যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জনগণ পুরাতন ব্যবস্থাকে তার কার্যপ্রণালি ও প্রতীকসহ ভেঙ্গে ফেলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করবে। ফলে সেখানে একটি নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অস্থিত্ব লাভ করবে। এমনিভাবে একটি নতুন সংস্কৃতিপূর্ণ সমাজের অবয়ব বের হয়ে আসবে এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক, ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি তার মতাদর্শের অনুকূলে হবে। এ ব্যবস্থা জনগণের চাহিদা পূর্ণ করে একটি স্বাধীন

জাতির ঐতিহাসিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধনে শাসক ও জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবে। ফলে সে ব্যবস্থা বিশ্বের স্বাধীন মানব প্রতিযোগিতার অঙ্গনে অতিসত্বর মানবিক উন্নতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

**তিন:** الثورة তথা বিপ্লব হচ্ছে: একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর নাম। আর الإصلاح তথা সংশোধন হচ্ছে: রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিতরে পরিবর্তন করার নাম। বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুরাতন ব্যবস্থা এবং তার কার্যপ্রণালী ও প্রতীকের সাথে সমঝোতা বা সংশোধন সম্ভব নয়। কারণ, আমূল পরিবর্তনের ভিত্তিতেই বিপ্লবের সূচনা হয়। সংশোধন বা মেরামতের ভিত্তিতে নয়।

কারণ, মেরামত ও সংশোধন পুরাতন শাসনব্যবস্থা বহাল রেখেই করা যায়। কোন বিপ্লবের দরকার হয় না। বরং এমন কিছু সংশোধনী কর্মশালা করলেই চলে, যা শাসক কবুল করে বাস্তবায়ন করবে; আবার কখনো তা প্রত্যাখান করবে। এ পদ্ধতিতে কিছু শহীদের রক্ত বৃথা যাবে। কারণ, পুরাতন ব্যবস্থার সাথে সমঝোতা করার অর্থই হবে এসব রক্তের সাথে গাদ্দারী করা। এমনিভাবে আন্দোলনের কল্পনার ক্ষেত্রও বৃথা যাবে। কারণ পুরাতন ব্যবস্থার সাথে পুনর্মিলন করার দ্বারা জনগণের মাঝে হতাশা ও নিরাশা তৈরী হবে। যে জনগণ চুক্তিগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় মাল-সম্পদ সরবারহ করেছে এবং শহীদদেরকে পেশ করেছে। তাজিকিস্তানের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সেখানে এমনটিই ঘটেছিল।

## ২- হিসাব-নিকাশ:

অর্থাৎ পূর্বের ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের সকল সেক্টর যে অপরাধগুলো করেছে, তার দৃষ্টান্তমূলক বিচার করা। যেমন তারা জনগণের অধিকার নষ্ট করেছে, তাদের মাধ্যমে দেশের সম্পদ লুট হয়েছে, দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছে, তাদের অনুসারী ও আমলাদের কারণে বা উপনিবেশবাদী দেশের কল্যাণে প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে তারা জাতির কল্যাণ ও ভবিষ্যত জলাঞ্জলি দিয়েছে।

অতঃপর তাদের থেকে জনগণের অধিকার কড়ায় গন্ডায় উসুল করা হবে। হরণকৃত সম্পদ তার প্রাপকের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে, ধ্বংসকৃত সম্পদের বদলা দেওয়া হবে, আর যে সম্পদের বদল বা ফিরিয়ে দেওয়া কোনটাই সম্ভব নয়, তার জন্য কেসাস বাস্তবায়ন করা হবে।

এরপর তাদের প্রত্যেকের অপরাধের ধরণ হিসেবে জেল, হত্যা, প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হবে। অথবা কেসাসের শাস্তি কার্যকর করা হবে। নির্দোষ মানুষের রক্তের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ির কারণে যে হিসাব নেওয়া হবে, তা স্বভাবতই রক্ত-সম্পর্কিত হবে। তাই বিপ্লবীরা ওদের ক্ষেত্রে কোন দয়া-মায়া বুঝবে না। কারণ বিপ্লবীরা পূর্বের ব্যবস্থার কাছে সে দয়া পায়নি। যদিও ইনসাফ দয়াকে আবশ্যক করে। বিপ্লব চলাকালে বিপ্লবীদের প্রস্তুতকৃত আদালতেই সে বিচার সম্পন্ন হবে। আদালতের কাছে পূর্বের ব্যবস্থার অপরাধ ও কদার্যতার নির্ভরযোগ্য সকল প্রমাণ বিদ্যমান থাকবে।

## ৩-সহিংসতা:

বিপ্লবের মাঝে রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। স্বভাবত: সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দেয় এমন নেতিবাচক উপায়ে বিপ্লব শুরু হবে। যেমন বিক্ষোভ মিছিল, ধর্মঘট, বিপ্লবীদের দাবীর প্রতিনিধিত্বকারী সংগীত। রাস্তায় ব্যারিকেড ও প্রতিবন্ধকতা তৈরী করা, রাস্তা কেটে দেওয়া, রেল চলাচল বন্ধ করা, যোগাযোগব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা, অফিস আদালত, মন্ত্রণালয় ও সরকারী সকল প্রতিষ্ঠান অচল করে দেওয়া। যদিও পেটোয়া বাহিনী নেতিবাচক উপায়ে দমন নীতি চালাবে, বিপ্লবকে তার সূচনাতেই শেষ করে দিতে চাইবে, বিপ্লবীদের দমনের উদ্দেশ্যে লাগামহীন হয়ে রক্ত ঝরাবে। দেশে বিস্ফোরণের পরিস্থিতি তৈরী করতে এবং বিপ্লবকে অতি দ্রুত পরিপক্কতায় পৌঁছাতে বিপ্লবীরা পুলিশ বাহিনীর এসব নির্বুদ্ধিতাকে কাজে লাগাবে। বিপ্লব বিস্ফোরণের মুহূর্তে জনগণ সরকার ও তার আমলাতন্ত্রের সাথে বিবাদের নিষ্পত্তি করতে শক্তি প্রয়োগের পথে এগিয়ে যাবে। এর জন্য জনগণ বড় ধরণের প্রস্তুতির অনুশীলন করবে। বরং পরিবর্তনের প্রয়োজনের তুলনায় বড় আকারে প্রস্তুতি নিবে। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে একই সময়ে বিক্ষিপ্ত করে নিঃশেষ করার বিষয়টি চূড়ান্ত করতে জনগণ তাদের কর্মতৎপরতাকে পুরো দেশে ছড়িয়ে দিবে। এক সময়

সরকারী বাহিনী বেসামাল হয়ে দমন নীতিতে উপনীত হবে। এ বাহিনী আদর্শিক বাহিনীও হতে পারে অথবা সরকারের সংখ্যালঘু বাহিনীও হতে পারে। মোটকথা, জনগণ সব ধরণের কঠোরতা কাজে লাগাবে। যাতে তাদের বিপ্লব গেরিলাযুদ্ধ ও সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নেয়। অতঃপর সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের পরিস্থিতি তৈরী করতে হবে। সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানের উপর হামলা করতে হবে। সরকারের নীতি নির্ধারকদের উপর বোমা হামলা ও গুপ্ত হামলার খণ্ড অভিযান চালাতে হবে।

ইতিহাসে শান্তিপূর্ণভাবে বা রক্তপাতহীন কোন বিপ্লবের নজির নেই। এ জাতীয় বিপ্লবকে সরকারী বাহিনী কোন পাত্তাই দিবে না। জীবন উৎসর্গ আর তাজা খুনের ত্যাগ ছাড়া কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। 'রক্তপাতহীন' কথাটি অনেকটা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ জনতার বিপ্লব চলাকালীন সময়ে রক্তপাত হবে না। এই পর্ব আসবে বিপ্লব পরবর্তী সময়ে। তখন আরো অধিক পরিমাণে রক্তপাতের ঘটনা ঘটে। কারণ, সরকারী বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের সময়ই মূলত: রক্তপাতের অধ্যায় আসে।

## ৪-নির্মাণ:

পূর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করার পর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ করা। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কাজ শুরু করা। কারণ, বিপ্লবগুলো পরিবর্তনের মতাদর্শ নিয়েই মূলত: প্রতিষ্ঠিত ও আন্দোলিত হয়েছে। যদিও বিপ্লবের ধরণ অনুসারে মতাদর্শ পরিবর্তিত হয়। সুতরাং এক চেতনা ও মতাদর্শকে ভেঙ্গে আরেকটি চেতনা ও মতাদর্শ বিনির্মাণের জন্য বিপ্লব সূচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বুর্জোয়া ও উদারনীতি রাজতন্ত্র পতনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনিভাবে স্বৈরাচারীব্যবস্থা পুঁজিবাদী বুর্জোয়ানীতি ও উদারনীতির গণতন্ত্রব্যবস্থা নির্মানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের দর্শন পূর্বের সকল ব্যবস্থা ভেঙ্গে গণতন্ত্রের সাথে সমাজতন্ত্র নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু সমাজতন্ত্রের সাথে গণতন্ত্রের বিশেষ একটা সখ্যতা আছে। আর ইসলামী দর্শন পূর্বের সকল ব্যবস্থা ভেঙ্গে আসমানী নীতিমালার ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিপ্লব যখন এই পর্যায়ে পৌঁছে যাবে, তখন তা একটি রাষ্ট্রের দিকে মোড় নিবে। তখন আশঙ্কা হয়, যে সমস্ত মৌলিক বিষয় ও চেতনাকে সামনে রেখে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল, এখন সে সব চেতনা হারিয়ে যায় কিনা! কারণ, এমনটি ঘটলে বিপ্লবের পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং বস্তুবাদী মনোভাবের অনুকূলে কাজ করে যাবে। যার কারণে সেটাকে অকেজো করতে হয়তো দীর্ঘ সময় লাগবে অথবা আবার নতুন বিপ্লবের প্রয়োজন পড়বে।

## ৫-সংস্কার:

বিপ্লবের কার্যক্রমগুলোকে স্থগিত করে রাখা উচিত হবে না। বরং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মের সঞ্চালন করতে হবে এবং জীবনের জটিলতাগুলো দূর করে জীবনকে পরিবর্তনের দিকে মনোযোগী করতে হবে। এর জন্য কঠোর অনুশীলন ও উদ্দমতার প্রয়োজন। কারণ, একটি দেশকে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভারসাম্য বজায় রেখেই সামনে এগিয়ে যেত হয়। এগুলোকে বাদ দিয়ে কোন রাষ্ট্র পরিচালিত হতে পারে না। পূর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনার নতুন নতুন ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ হতে পারে না। অপরদিকে কোন শাসকগোষ্ঠী যদি শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য চিন্তাশীল ও উদ্ভাবনী নেতৃত্ব তৈরী করতে না পারে, তবে সে রাষ্ট্র পূর্বের ন্যায় আবারো অচল হয়ে যাবে। ফানুস জাতীয় এক ধরণের অবস্থা তৈরী হবে, সেখানে মাথা গুজে থাকবে এবং উন্নতিকে প্রত্যাখান করবে। তাই এ ফানুস অবশ্যই ক্রমাগত ছিন্ন করা উচিত। সারকথা হচ্ছে, শাসনের সকল সেক্টর যখন স্থির হয়ে যাবে, তখন তার বর্তমান নেতৃত্ব সেই অবস্থার দিকেই এগিয়ে যাবে, যার কারণে পরিবর্তনের বিদ্রোহ জন্ম নিয়েছে। সুতরাং তারা বর্তমান প্রজন্মের উৎসাহ, বুদ্ধিবৃত্তিক ও কৌশলগত উন্নতি, সময়ের গতি ও উন্নয়ন এবং পরিবর্তনকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। কেননা, এটাই হচ্ছে সেই পরিস্থিতি, যাকে সর্বদা ধ্বংস করা আবশ্যক।

## ৬-নিরাপত্তা বিধান:

বিপ্লবীদের, নব প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার, জনগণের এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এখানে চারটি শব্দকে সমষ্টিগতভাবে একশব্দে বললে 'উম্মাহ' তথা 'জাতি' হয়। এই নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে- অস্ত্র, সুষ্ঠ বিচারব্যবস্থা ও অন্যান্য বিশেষ উপকরণের মাধ্যমে। বিপ্লবের পূর্ব মুহূর্তে, বিপ্লব চলাকালে এবং শাসকের আত্মসমর্পণের পর প্রথম কর্তব্য হলো: বিপ্লব ও বিপ্লবের ফলাফলকে রক্ষার্থে এমন একটি সামরিক নিরাপত্তাবাহিনী তৈরী করা, যারা সরাসরি বিপ্লবের নেতৃত্বকে মান্য করবে। এটা সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে রক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। অবশ্য বিপ্লবীদের বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনাকে রক্ষা করাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং পূর্বের সেনাবাহিনীর কোন সদস্য যদি নতুন সেনাবাহিনীতে এসে যোগ দেয়, তাহলে তারা আগের মনোভাব থেকে ফিরে এসেছে ভেবে তাদেরকে পূর্বের বাহিনীর সাথে সম্পর্ক রাখার সুযোগ দেওয়া যাবে না। অথবা দেশের প্রয়োজনে পূর্বের ব্যবস্থার আঞ্চলিক সমর্থনের শক্তিকে দেশের মুনাফার কাজে অনুমোদন দেওয়া যাবে না। কারণ, তখন তাদের শত্রুতা অন্ধকারে কাজ করে যাবে।

এমনিভাবে তাদের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের সাথে সহযোগিতার কোন সম্পর্ক থাকবে না। এমনিভাবে বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের প্রত্যাশাকে সীমাবদ্ধকারী কোন নিয়ম বা পরিস্থিতি বাকি রাখা কখনোই গ্রহনযোগ্য হবে না। যেমন: এমন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তি ও ঐক্য, যা আমাদেরকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক বা প্রযুক্তির উন্নতি থেকে ফিরিয়ে রাখবে, অথবা আমাদের আকিদা লালনকারী ভাইদের কাছাকাছি আসতে বাঁধা দিবে, অথবা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি কিংবা পরাশক্তিদের স্বার্থ রক্ষা করা ছাড়া যাদের অন্য কোন লক্ষ্য নেই, এমন আন্তর্জাতিক কোন সংস্থা অন্তর্ভূক্তির ঝুঁকি তৈরী করবে।

এ জাতীয় সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে হবে, যতক্ষণ না আমরা বাস্তবিকপক্ষে এমন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কথা বলতে পারছি, যা কারো আদেশ বা উপদেশের অপেক্ষায় থাকবে না। আর বাস্তবিকপক্ষে প্রতিবিপ্লবী শক্তি ও তার আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সমর্থকদের শক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত বিপদাপদ প্রতিরোধ ও নির্মূল করার উপায় সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে জনগণের বিবেক বুদ্ধির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছাড়া এটা কিছুতেই পূর্ণ হবে না। সুতরাং বিপ্লব সংস্কৃতি বিবেককে সুরক্ষিত করে, যাকে কোন গুজব ছিদ্র করতে পারে না। দেশের জাতীয় সিদ্ধান্তকে আলোকিত করে, যাকে কোন শলা-পরামর্শ ভাঙতে পারে না। জনগণের অভ্যন্তরীণ ঐক্যকে মজবুত করে, যেখানে শত্রু তার বন্ধুসূলভ আচরণের আড়ালে প্রবেশ করতে পারে না। জনগণের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত করে, যাতে উপনিবেশবাদের কূটকৌশল সহজে বুঝতে পারে, যখন সে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তির আড়ালে দেশে কর্তৃত্ব করার উদ্দেশ্যে আরেকবার ফিরে আসার ইচ্ছা করবে। শত্রুর তত্ত্বাবধানে এবং তাদের থিওরি অনুসারে বিজ্ঞান চর্চার জন্য আন্তর্জাতিক মন্ডলে বৈজ্ঞানিক মিশন প্রেরণের সময় এটিও যে একটি বড় ত্রুটি তা বুঝতে পারে।

এমনিভাবে তথ্যগত পরিকল্পনার ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে। কারণ, এসব ভুল তথ্য আর ভ্রান্ত আকিদা-বিশ্বাসের কারণে দুনিয়াটা তার কাছে গোলক ধাঁধাঁর মত হয়ে যাবে। ফলশ্রুতিতে সে দ্বীন থেকে অনেক দূরে সরে পড়বে। অথচ দ্বীনই হচ্ছে একজন মানুষের জীবনের মূল ভিত্তি ও লক্ষ্য।

অনুরূপভাবে জনগণকে শত্রুর ব্যাপারে সতর্ক করার মাধ্যমে যেমন নিরাপদ করা যায়, তেমনি তার রিয়েল এক্সটেনশনের মাধ্যমে এবং বন্ধু-বান্ধবের মাধ্যমেও সতর্ক করা যায়। এটিই একটি জাতির মতাদর্শের সাথে সম্পর্কিত মৌলিক আকিদা-বিশ্বাস। সুতরাং ভাষাগত পার্থক্য, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা, জাতিগত ভিন্নতা ইত্যাদি বিষয়গুলোর মিল-অমিলের উপর ভিত্তি করে মৌলতত্ত্বের মাঝে ভিন্নতা সৃষ্টি করা যাবে না। কেননা, আকিদার সম্পর্কই হচ্ছে প্রকৃত সম্পর্ক। যার আকিদা যেমন তার আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়াগুলোও তেমনি হয়। উম্মাহর ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য আকিদার সম্পর্কই হলো প্রকৃত সম্পর্ক। যার ভিত্তিতে উম্মাহ/জাতি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। যতক্ষণ না আত্মারা তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেছে!! এবং তার সত্তাকে অস্বীকার করেছে!! তথাপিও সে তার আকিদার সাহায্যার্থে প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী হবে।

## বিপ্লব প্রাদুর্ভাবের কারণসমূহ:

জনগণ বিদ্রোহের আগুনে জ্বলে উঠতে হবে। তাদের এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, বিপ্লবের যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং তাদের মাঝে অধিকার হারানোর চেতনা জাগ্রত করার জন্য একজন যোগ্য নেতা থাকতে হবে। বিপ্লবকামী জনতার কাছে হারানো অধিকারের চেতনা জাগ্রত করার কাজটি বিপ্লবকে নেতৃত্ব দেওয়া জন্য অবিচ্ছিন্ন নির্দেশনার মাধ্যমে হতে পারে, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, আলেম, জ্ঞানী এবং বিপ্লবের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমেও হতে পারে। অথবা মানুষের মনের মাঝে জালিমের প্রতি জমে থাকা ক্ষোভ ও ক্ষোভের উপলব্ধিকে কাজে লাগিয়েও এই কাজটি করা যেতে পারে। ভৌগোলিক অবস্থান এবং সময়ের ভিন্নতার কারণে প্রত্যেক বিপ্লবের কিছু ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য থাকে। অবশ্য শত ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রতিটি বিপ্লবের কিছু সামষ্টিক উপাদান থাকে। বিপ্লবের জন্য কখনো তার এক বা একাধিক উপাদান যথেষ্ট হয়। উপাদানগুলো হচ্ছে-

### ১-শাসকশ্রেণী নিচের যে কোন অবস্থার মাঝে এক ঘরে হয়ে যাবে:

যখন শাসক ও তার সকল পরিষদ এক শূন্যগর্ভে বাস করবে, উন্নতি সাধনে অক্ষম হয়ে পড়বে (দেউলিয়া অবস্থা), জনগণের সাথে তার সম্পর্কে ভাটা পড়ে যাবে, অথবা সেনাবাহিনীর একটি অংশ কর্তৃত্ব করবে এবং এর দ্বারা পুরো বাহিনীর উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করবে, ক্ষমতা পরিবর্তনের নীতির প্রতি কোন লক্ষ্য করবে না, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতার স্বীকার হবে, শাসকশ্রেণী শাসন ক্ষমতায় থাকার জন্য সার্বিকভাবে যৌক্তিকতা হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও তারা ক্ষমতায় থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাবে, শাসকদের প্রতিটি সেক্টর জনগণের প্রতি খেয়াল না রেখে নিজেদের কল্যাণকর বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে নিজেদেরকে দায়মুক্ত করবে এবং নিজেদেরকে এমনভাবে প্রকাশ করবে, যেন তারা অনেক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এক নতুন শ্রেণী। অথচ সম্পদ বণ্টনের নীতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। তখন অসন্তোষের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে, সর্বমহল থেকেই পরিবর্তনের দাবি উঠতে শুরু করবে। শাসকশ্রেণী যদি ভারসাম্যপূর্ণ হয়, তবে তারা এহেন পরিস্থিতিতে সংশোধনের দিকে আগাবে। কিন্তু স্বভাবতই তারা অসন্তোষ পোষণকারীদের দাবি-দাওয়া পূরণ করবে না। আর যদি শাসকশ্রেণী পশ্চাদমুখী হয়, তবে এমন দমনমূলক ধ্বংসাত্মক মূর্তি ধারণ করবে যে, তাদের এই ধ্বংসাত্মক মনোভাবের কারণে জনগণের সাথে শত্রুতা এবং রাষ্ট্রের নিঃসঙ্গতা আরও বহু গুণে বেড়ে যাবে। এ উভয় শাসনব্যবস্থার মাঝে দিগন্তে বিপ্লবের বিদ্যুৎ চমকাবে। যার পথ ধরে জালিমদের শাসনব্যবস্থা ধ্বংসের কারণগুলো বৃদ্ধি ও ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিপ্লবের বিদ্যুৎ চমকও বড় থেকে বড় হতে থাকবে।

## রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংসের কারণসমূহ:

যেসব কারণে চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়, সেগুলো হলো- রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কারমূলক কর্মকান্ড থেমে যাওয়া, প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, তার আভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা দুর্বল হয়ে পড়া, নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করা, তাদের সংস্কারমূলক ও সংশোধনী কর্মকান্ডগুলো জনগণের ইচ্ছানুযায়ী না হওয়া, তাদের ক্রোধ ও অসন্তোষের মূল্য না দেওয়া, যখন শাসকশ্রেণী সাধারণ জনগণের উপর দমনমূলক শাস্তি প্রয়োগ করবে, যেগুলোর কারণে তাদের ও জনগণের মাঝে ক্রমশ শত্রুতা ও দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে, দমনের মাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষমতাশীনদের নিঃসঙ্গতা বৃদ্ধি পাওয়া, জুলুম-অত্যাচার বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপ্লবী সঙ্কট পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে যাওয়া, সাধারণ জনগণের উপর কঠোরতা ও নিষেধাজ্ঞা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অন্যান্য দল ও গোষ্ঠিগুলো থেকেও সরকার পরিবর্তনের আওয়াজ উঠা, জনগণের পক্ষ থেকে অনেক বেশী পরিমাণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাওয়ার কারণে বিপ্লব সঙ্কট পরিপক্ক হওয়া, সহিংসতা বৃদ্ধি মানে ক্ষমতাসীনদের সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে যাওয়া

এবং জনতার দাবি পূরণকারী সমাধান দানে ও সৃষ্টিশীল ক্ষমতা থেকে অক্ষম হওয়া। সংলাপ জনপ্রিয় বিপ্লবকে উপেক্ষা করার প্রয়াস ব্যতীত অন্য কোন কাজে না আসা, শুধুমাত্র অকেজো থেকে যাওয়া। ফলে তা পরম সহিংসতায় রূপান্তরিত হওয়া। শাসনব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ থেকে পরিবর্তন করা বা এটি গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ার দরুন তা পরিত্যাগ করা এবং বিপ্লব আবশ্যক হয়ে যাওয়া। এমন আরো অনেক কারণ আছে, যেগুলোর কারণে সাধারণ মানুষ চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন কামনা করে।

## ১-অর্থনৈতিক সঙ্কট:

জনগণ ভবিষ্যতে ভঙ্গুর অর্থনীতির কারণে বিরাট অস্থিরতার স্বীকার হবে। এর থেকে উত্তরণের জন্য সরকার নিস্ফল চেষ্টা করে যাবে, পরিণতিতে সঙ্কট শুধু বেড়েই যাবে, কিন্তু কমবে না। যখন জনগণের দাবী-দাওয়ার প্রতি অবজ্ঞাবশত: এ সমস্যা সমাধান না করে শাসকশ্রেণী নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে, তখন অস্থিরতার মাত্রা আরা কয়েকগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং জনগণের অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘতর হতে থাকবে। আবার কখনো কখনো এ অপেক্ষা নিরর্থকও প্রমাণিত হতে পারে। এমনটি হলে জনতার সামনে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া বিকল্প কোন সমাধান থাকবে না।

## ২-যৌথ বিস্ফোরণ:

একইভাবে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণকারী রাষ্ট্রযন্ত্রের কারণে সৃষ্ট সামাজিক গোলযোগ পুঞ্জীভূত হতে থাকবে। তাদের ক্ষোভগুলোকে প্রশমিত না করে বরং তাদের উপর কর্তৃত্ব করে যাবে। জনতাকে ভবিষ্যত বিনাশী সঙ্কটে ফেলে দিবে। যুবকদের মাঝে বেকারত্ব ছড়িয়ে পড়বে। কিছু অর্থনৈতিক বা সাংবিধানিক বিষয়ের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারিত করবে। এমন পরিস্থিতিতে দেশের সর্বময়ী ক্ষমতা ও অর্থনীতি শাসকদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে থাকে। আর এ ধরণের সঙ্কট ও নির্যাতন সেসব শাসকদের দ্বারাই হতে পারে, যারা নিজেদেরকে দেশ ও দশের একচ্ছত্র অধিকারী ও একমাত্র মালিক মনে করে। আবার স্বৈরাচারী সামরিক শাসক কর্তৃকও হতে পারে। যারা সামন্ত প্রথার মত অনুপ্রবেশ করে নিজেদেরকে শাসকশ্রেণীর মত দেশের ও জনসাধারণের একচ্ছত্র মালিক ভেবে থাকে। সেনাশাসন ও রাজশাসন উভয় ব্যবস্থার মাঝে সম্পদ বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সম্পদের মজুদদারী বৃদ্ধি পায়। তারা বহির্রাষ্ট্র (জর্দান সরকার ও মিসরের সেনা সরকার) থেকে বেতন বা ঘুষ নিয়ে থাকে। দেশে নিজেদের পক্ষীয় লোকদের সর্বোচ্চ পদে বসায়। দেশের বড় বড় কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানের মালিক বনে যায়। ফলে কর্তৃত্ব ও সম্পদ জনগণের কাছে না গিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রনে চলে যায়। জাতীয় সম্পদ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ব্যয় করে। ফলে তাদের বিলাসিতা, চাকচিক্য, অপব্যয় আর দায়িত্বহীনতা চোখে পরার মত হয়ে যায়। ফেতনা-ফ্যাসাদ আর বিশৃঙ্খলা তাদের দৈনন্দিন রুটিনে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ সব কিছুর উপরে প্রাধান্য পায়। আসল বিষয়গুলোকে ধ্বংস করা হয়। ফলে চরিত্রবান আর চরিত্রহীনের মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। ভদ্রতা আর আনুগত্য স্মৃতিচারণের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। ফলে জনগণ এসব বিশৃঙ্খলার শিকার হবে। ক্ষুধায় ছটফট করবে এবং বেকারত্বের কারণে অভাব অনটন আর দরিদ্রতায় ভুগে মরবে। আর এ সকল বিষয় সামাজিক বিস্ফোরণের জন্ম দিবে।

## ৩-বিভিন্ন যুদ্ধ ও যুদ্ধে পরাজয়সমুহ:

পরাজয়ের ফলাফল দেশে সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের তীব্রতা বাড়িয়ে দিবে। ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-সম্মান এবং অসংখ্য অগণিত তাজা প্রাণ বিসর্জন দেয়ার মধ্য দিয়ে মূলত: বিপ্লবের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হবে। সাধারণ জনগণের চিন্তা-চেতনা ও গতিপথকে নতুন করে বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরাজয়ের পরবর্তী সময়টাই অধিক উপযুক্ত। বিজয়ী রাষ্ট্রগুলোতে বিপ্লবের নামও মানুষের উল্লেখ করা লাগে না, বিপ্লব তো অনেক দূরের

কথা। যেহেতু এসব দেশে বিপ্লবের কোন প্রয়োজন ও পরিস্থিতি নেই, সেহেতু সেই দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাঝে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতামূলক কিছু আলোচনা-সমালোচনা হয়।

## ৪-বহির্বিশ্বের চাপ:

যখন ঔপনিবেশিক শক্তি বা তাদের এজেন্ডারা উম্মাহকে তার স্বাতন্ত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে, জনগণের সাথে অবহেলাপূর্ণ আচরণ করবে, মজুরিহীন শ্রমের মাধ্যমে তাদের থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগ করবে, জনগণের ও দেশের সম্পদ লুট করে নিয়ে যাবে, সাধারণ জনগণকে নিঃস্ব-হতদরিদ্র করার জন্য কোন অপচেষ্টা বাদ দিবে না, তাদেরকে উন্নতির পথে বাধা দিয়ে অবনতির অতল গহ্বরে ঠেলে দিবে, উম্মাহকে তাদের ধর্মীয় চাহিদা, কৃষ্টি-কালচার পালন, আকিদা-বিশ্বাস ও মাতৃভাষা থেকে বাধা প্রদান করবে, তাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টায় মত্ত থাকবে এবং ঔপনিবেশিকদের সংস্কৃতি, ভাষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও স্বভাব-চরিত্র গ্রহণে বাধ্য করবে। যখন তারা এসব ন্যাক্কারজনক কাজ করতে থাকবে, তখন জনগণ মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার নেশায় বিভোর হয়ে উঠবে।

## ৫- আকিদা-বিশ্বাস এবং পবিত্র বিষয়গুলো নিয়ে তামাশা করা:

বিশেষ করে মুসলিম দেশের শাসকরা প্রজাদের ধর্মীয় চেতনাকে খুব সহজ উপায়ে পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এর উদ্দেশ্য হলো: তারা জনসাধারণের আকিদাগত ঐতিহ্য এবং সামাজিক দৃঢ় অবস্থানকে খণ্ড-বিখণ্ড ও বিভক্ত করে ফেলতে চায়। অথচ এই বিষয়টি জনগণের কাছে তাদের জাতীয় সুরক্ষার চেয়েও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলামের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়, মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে রেখে হারাম কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তি পূজার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, হারাম কাজের পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়, শক্তি প্রয়োগ করে সমাজে হারামগুলো ভরপুর করে দেওয়া হয়, শুধু তাই নয় বরং তা গ্রহণে বাধ্যও করা হয়। আবার কখনো ভিন্ন মতাদর্শ লালনকারী বহিরাগত শত্রুরা এসে সরাসরি দেশ দখল করা শুরু করে, নৈতিক ও বোধগম্য দ্বীনি বন্ধনকে ভেঙ্গে ফেলতে আরম্ভ করে। তখন জনগণ তাদের ঐতিহ্য ও আত্মমর্যাদার বলে বলিয়ান হয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশ দ্রুতই রক্তক্ষয়ী স্বশস্ত্র আন্দোলনের রুপ লাভ করে। আর স্বভাবতই তাতে তীব্রতা ও রক্তস্রোত শুরু হয়। দেশের আনাচে কানাচে ও সমাজের সর্ব মহলে তা গ্রহণযোগ্যতা পায়। বহির্বিশ্বের কাছে তা একটি আদর্শিক শক্তিশালী আন্দোলনের রূপ নিবে এবং বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থনৈতিক ও জনবলের মাধ্যমে সাহায্য-সহযোগিতা করা হবে। সাধারণত: এসব যুদ্ধ ও বিপ্লব এক যুগ বা তার চেয়ে কিছুটা কম-বেশী সময়ের মাঝে সমাপ্ত হয়ে যায়। কারণ, বিপ্লবীদের প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা দায়িত্বশীলরা অভিজ্ঞতায় নতুন। যার ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে তাদের ভুল-ভ্রান্তি হতে থাকে। অবশ্য নতুন ঘটনা প্রবাহ, গুণীজনদের পরামর্শ ও বিপ্লবের পুরো সময় জুড়ে তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলো তাদেরকে ক্রমান্নয়ে সৃজনশীল পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য উপযোগী করে তোলে। এভাবে তারা একটা সময়ে দেশ ও জনগণের চাহিদা, প্রয়োজন ও সঙ্কটগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে জনগণ একটা সময়ে ধীরে ধীরে আন্দোলন এবং আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তগুলো মেনে নিতে থাকবে, ধৈর্যের সাথে তাদের সহযোগিতা করে যাবে এবং চলমান রাষ্ট্র যন্ত্রের ধারক বাহকদের থেকে দেশকে মুক্ত করতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। যেমনটি ঘটেছিলো আফগানিস্তানে তালেবান আন্দোলনের সময়। এই কারণগুলোর উপর একক বা সামষ্টিকভাবে বিপ্লবের উদ্দেশ্যগত দিকটি নির্ভর করে। কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ ছাড়া শুধু এক পক্ষ নিয়ে বিপ্লব শুরু হবে না। কারণ এটাই বিপ্লবের মৌলিক অংশ। যা জনতার সমস্ত শক্তি-সামর্থ, বুদ্ধি ও স্বাধীনতা লাভের আগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত। আর সব কিছু তৈরী হওয়ার পর একটি পরিপক্ক বিপ্লবী গোষ্ঠীর প্রয়োজন দেখা দিবে। যারা জনগণকে তাদের হারানো অধিকার সম্পর্কে জাগ্রত করবে, সরকার কর্তৃক দেশের সম্পদ চুরি ও লুণ্ঠন, তাদের উপনিবেশবাদ, অবৈধ প্রভাব বিস্তার ইত্যাদি বিষয়গুলো জনগণের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরবে এবং তাদেরকে এসব কিছুর পরিবর্তনের বিভিন্ন

পদ্ধতি বলে দিবে। এরপর বিপ্লবের নেতৃত্ব হাতে নিয়ে, তা পরিপক্কতায় পৌঁছা পর্যন্ত কাজ করে যাবে। এটাকে বিপ্লবের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনার স্টেপ/স্তর বলে। পরবর্তীতে এই সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

***

## বৈপ্লবিক চিন্তাধারা বা মতাদর্শ:

বিপ্লবের কিছু মূল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে শানিত করে। সেগুলো হলো: চেষ্টা সাধনার ফলে ঐতিহাসিক উন্নতি সাধন, প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, সবকিছুকে পুনরায় নির্মাণের মাধ্যমে বিপ্লবের লক্ষ্য বাস্তবায়ন এবং অবস্থার স্থিতিশীলতা আনয়ন করা।

## বৈপ্লবিক চিন্তাধারা নিম্নরুপ:

যেকোন একটি মতাদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য বিপ্লবের সূচনা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেই মতাদর্শ ও শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের মৌলিক ও মানবিক অধিকার অর্জিত হবে, সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং চলমান জুলুমি শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। এই পরিবর্তনের জন্য সংগঠিতভাবে যেই আন্দোলন শুরু হবে, তার ছায়াতলে বিপ্লবীরা এসে স্বেচ্ছায় স্বশক্তিতে আশ্রয় নিবে। সূচনাতে বিপ্লবীরা নতুন বিশ্ব বিনির্মাণের লক্ষ্যে দেশের ক্ষমতাশীন সরকার ও তাগুতদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরিত হবে। (যেমন সৌদি রাজপরিবার একচেটিয়া ক্ষমতা, অর্থ ও আধিপত্যে বিস্তারের মাধ্যমে জনগণের উপর খবরদারী করা, তাদের দ্বীনবিরোধী তথা দ্বীন ধ্বংসকারী হুকুম জারি করা... বিপ্লবের সম্ভাব্য একটি মডেল) 'নতুন বিশ্ব' অর্থাৎ প্রশাসন, অর্থনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার মাঝে আমূল পরিবর্তন সাধন করা।

আর বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা ও আকিদা-বিশ্বাস প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু বিষয়কে ঘিরে হয়ে থাকে, যেগুলো রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর জন্য বাস্তবিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়।

বিপ্লবী আকিদা বা দর্শন বাস্তব জীবনে মূর্তমান কিছু বাক্যের সমষ্টির মধ্য দিয়ে আবর্তিত হবে। (যেমন: নতুন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্যাচারী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে সহিংস আন্দোলন শুরু করা।)

বিপ্লবের চিন্তাধারাকে বাস্তবতার দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন একটি বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবিক দিক এবং একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মানবিক দিক। এটা সম্ভব যে, বস্তুনিষ্ঠ উপকরণগুলো (বিপ্লবের উপকরণের সহযোগিতা) বেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে। কিন্তু দ্বিতীয় দিকটির (পরিবর্তনের ইচ্ছা) অভাব দেখা দিবে। যার কারণে বিপ্লব সূচিত হবে না। তাই বিপ্লব সাধনের জন্য উভয় দিককেই একসাথে কাজে লাগাতে হবে। যার কথা আগে বলা হয়েছে। এমনটা হলে বিপ্লবীরা একাই পরিবর্তন ঘটাতে পারবে। কারণ এ পরিবর্তন জাতির কাঙ্খিত দাবি-দাওয়া পূরণ করবে। আর তারা বিপ্লবের সহিংস পরিস্থিতিতে জীবন উৎসর্গের সর্বোচ্চ নজির পেশ করার জন্যও প্রস্তুত থাকবে।

অন্যদিকে রাজতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক বা অন্য যেকোন শাসনব্যবস্থা মনে করে যে, বিপ্লবের মাধ্যমে পরিবর্তনের চিন্তা করাটা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক চিন্তা-চেতনা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সুষ্ঠ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রত্যেক সুশৃঙ্খল সমাজের জন্যই আবশ্যক। যেকোন সমাজে সব দিকের স্থিতিশীলতার মাধ্যমে সমাজের প্রকৃত স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। আর শাসকশ্রেণীর এ প্রচারণা একটি স্বাভাবিক বিষয়। অতএব, তারা দেশের আর্থ-সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রতি অতটা গুরুত্ব দিবে না যতটা গুরুত্ব দিবে নিজেদের উপযোগী পরিবেশকে আপন অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে। এই চিন্তা-চেতনাই তাদেরকে নিজেদের

শাসনব্যবস্থা রক্ষার জন্য মরণপণ চেষ্টা করতে বাধ্য করে এবং বিপ্লবকে একটি সহিংস কাজ হিসাবে আখ্যায়িত করে। সুতরাং তারা বিপ্লবের মুখোমুখি হোক বা প্রতিবেশী বিপ্লবের সংক্রমণের আশঙ্কা করুক, উভয়টাই তাদের জন্য বরাবর।

***

## বৈপ্লবিক পদযাত্রার স্তরসমূহ

বিপ্লবের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদেরকে প্রত্যেক দেশের এবং যুগের বৈশিষ্ট্য ও গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেই দেশের ও সেই যুগের বিপ্লবের ধরণ কি, গতিবিধি কেমন, পরিণতি কেমন হয়েছে বা হতে পারে? ইত্যাদি বিষয় সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যে কোন আন্দোলন-সংগ্রাম ও বিপ্লব-বিদ্রোহের কয়েকটি স্তর থাকে। পর্যায়ক্রমে সেগুলো পাড়ি দিতে হয়।

### ১-সূচনা এবং প্রস্তুতির স্তর:

#### ক. বিপ্লবের বীজ রোপন করা।

বিপ্লব বিষয়ের গবেষক টিম দেশের সকল সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। শক্তির মাধ্যমে সে সব সমস্যা নিরসন করবে, কৌশল ও টেকনিক নির্ধারণ করবে, বিপ্লবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ঠিক করবে, সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তো সর্বপ্রথম গবেষক দল এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। অতঃপর সেই অনুযায়ী পরবর্তী স্তরে অগ্রসর হবে।

এরপর জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং বিপ্লবের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। অতঃপর যে কোন মূল্যেই হোক, কোণঠাসায় থাকা অন্যান্য দলগুলোর সাথে মৈত্রীতে আবদ্ধ হতে হবে। যারা সরকারের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে আছে বা সরকারের নির্যাতনের স্বীকার হয়ে আছে। ব্যাপকভাবে মানুষকে বিপ্লবের প্রতি উৎসাহ দিতে হবে। তাদের সামনে দেশের মধ্যে চলমান বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক নৈরাজ্যগুলো তুলে ধরতে হবে। যেন এর দ্বারা তাদের মাঝে বিপ্লবের মানসিকতা তৈরী হয় এবং গণবিপ্লবের জোয়ার শুরু হয়। আর বিপ্লব চলাকালীন সময়টুকু এতটাই সংকটময় যে, এ সময় বৈপ্লবিকদের উপর সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা চূড়ান্ত পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করে, সার্বক্ষণিক দমন-পীড়ন চলতে থাকে, আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো ক্রমেই সর্বশেষ পর্যায়ের দিকে গড়াতে থাকে, একের পর এক প্রাণহানি হতে থাকে এবং জনসাধারণের মনে এই প্রত্যয় জাগে যে, এহেন নাজুক পরিস্থিতিতে প্রতিপক্ষের সাথে শান্তিপূর্ণ সমাধানে ফিরে গেলেও কোন শান্তি ফিরে আসবে না। বরং শুধুমাত্র এমন শান্তিপূর্ণ সমাধানের চিন্তা-ভাবনা করলে শহীদদের সেই পবিত্র রক্তের সাথে গাদ্দারী করা হবে, যেই রক্তবন্যার শ্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, এই জাগরণকে চূড়ান্তভাবে সফল করার জন্য।

#### খ. ঐতিহাসিক পরিস্থিতি থেকে করণীয় নির্ধারণ করা:

এই পর্যায়ে এসে মানুষের মনের মাঝে বৈপ্লবিক সজাগ মানসিকতা এবং পরিবর্তনের উচ্চ মনোবল পরিপূর্ণরূপে থাকতে হবে। তবে এই সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো রাতের মত বিপদাপদের স্বীকার হতে হবে। সমুদ্রের ঝড়ের ন্যায় মহাপ্রলয় ধেয়ে আসবে। যেমন: জনপ্রিয় ব্যক্তিদেরকে গুম করা হবে, কোন কোন আন্দোলনকারীকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, আবার কাউকে হত্যা করা হবে, কখনো সভা-সমাবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হবে, শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দিবে, বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তা কর্মীদের সাথে সংঘর্ষ হবে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে এবং জননেতাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। বিপ্লবীদেরকে হতাশ করে দেওয়া, তাদের ক্ষতি সাধন করা এবং তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। এই নাজুক মুহূর্তে মানুষের মাঝে দু'টি শ্রেণী তৈরী

হয়ে যাবে। একদল নিরাশ হয়ে পেছনে ফিরে যাবে, কষ্টে জর্জরিত হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে চাইবে। আরেকদল শত বাধা-প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। নতুন উদ্যমতার সাথে পাহাড়সম দৃঢ়তা নিয়ে শক্তিধর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ময়দানে আবির্ভূত হবে, জনগণকে জাগিয়ে তুলবে এবং বিপ্লবের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের জন্য যা কিছু করা দরকার, তারা তার সবটুকুই করবে এবং সবার মাঝে প্রতিশোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিবে। (যেমনটি ২৫ জানুয়ারীতে মিশরে ঘটেছিল।)

উত্থানকামী প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই অন্যান্য সাধারণ জনগণ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। আন্দোলনরত জনগোষ্ঠিকে এই মানসিকতা পরিহার করতে হবে যে, আন্দোলন যেভাবেই অগ্রসর হোক একসময় সফলতা এমনিতেই চলে আসবে। বরং তাদেরকে সফলতা ও বিজয়ের জন্য অপেক্ষায় না থেকে সেটি অর্জনের জন্য সতর্কতার সাথে কঠোর চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। বিজয়ের জন্য খুব তাড়াহুড়া করা যাবেনা, যাতে মাঝপথ থেকে ফিরে আসা যায়। আবার এমন দেরীও করা যাবে না, যাতে উপযুক্ত সময় ছুটে যায়।

এই স্তরে প্রচুর পরিমাণ সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ, অবরোধ হয়ে থাকে। পাশাপাশি এর হাত ধরেই সকলের মাঝে বিপ্লবের স্পৃহা তৈরী হয়।

## ২-পূর্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস করার স্তর:

পঞ্চম অনুচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করেছিলাম। বর্তমান সময় এবং মানুষের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের চিন্তাশক্তি ও সৃষ্টিশীলতারও উন্নতি হয়েছে। আমি এখানে পূর্ববর্তী বিপ্লবীদের কিছু মুহূর্তের কথা উল্লেখ করবো। সেসময় তারা যে সমস্ত মৌলিক বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছিল।

### প্রথমত: নিরাপত্তাকর্মী এবং সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর-পাকড়:

আন্দোলনকারী জনতার উপর চালানো নির্যাতন ও দৈনন্দিন বহু ক্ষয়-ক্ষতি সত্ত্বেও কোনভাবেই প্রধান প্রধান সড়কগুলোর দখল ছেড়ে দেওয়া যাবে না। যতই নির্যাতন চালানো হোক না কেন, তারা সেখান থেকে কর্তৃত্ব উঠিয়ে নিবে না। তাছাড়া এমন পরিস্থিতিতে সহিংসতার মোকাবেলা সহিংসতার মাধ্যমেও করা যাবে না।

**এর পেছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য আছে-**

**ক.** সরকারী বাহিনীর মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা।

**খ.** অনেক সময় বিদ্রোহী জনতার পরিচয় বহন করে পুলিশ বা তাদের নেতৃত্বে জঘন্য খারাপ ও নোংরা কাজ করা হয়। তারা এসব জঘন্য অপকর্মের দায়ভার বিপ্লবীদের উপর চাপিয়ে দেয়। সরকারী অফিস-আদালত, মন্ত্রণালয়ে অগ্নিসংযোগ করে, মসজিদ ও মন্দিরে বিস্ফোরণ ঘটায়, নিজেরাই নিজেদের কিছু অফিসার ও সেনা সদস্যকে হত্যা করে, সাংবাদিকদেরকে গুম ও খুন করে, ওলামায়ে কেরামকে হত্যা করে। তারা এ ধরণের বহু অপকর্ম সাধন করে থাকে। জনগণকে সেই দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং বিপ্লবীদেরকে তাদের কাছে খারাপ হিসেবে দেখানোর জন্য। এমন কিছু মুহূর্তে তাদের উপর আক্রমণ বা এর প্রতিবাদ করার সুযোগ পেয়েও তা ছেড়ে দিতে হবে।

**গ.** সরকারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া। যদিও সে অপরাধী, তারপরও মানুষ হিসাবে তার উপর এটার প্রভাব পড়বেই। ফলশ্রুতিতে সে দিশেহারা হয়ে মিডিয়ার সামনে এসে বিভিন্ন দুর্বোধ্য বাক্য দিয়ে, হুমকি-ধমকি দিয়ে, রটানো গুজব বলে এবং নির্লজ্জভাবে মিথ্যাচার করে বিবৃতি দিবে। অতঃপর তার ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও সময় ফুরিয়ে যাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। তার কাছের মানুষগুলো তার চলমান ক্ষমতার ব্যাপারে আস্থা হারিয়ে ফেলবে। ফলে সে তার মদদপুষ্ট কাছের মানুষগুলো থেকে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণভাবে খুব দ্রুততার সাথে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে।

## নির্যাতনকারী বাহিনীর মোকাবেলা করা:

এটি বিপ্লবকামীদের জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ। কারণ, এই পর্যায়ে এসে তারা এমন এক বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করতে যাচ্ছে, যারা সীমালঙ্ঘন ও জুলুম-নির্যাতনের চূড়ান্ত পর্যায় অতিক্রম করেছে। তারা কোনরূপ বাধা-বিঘ্নতা ছাড়াই একের পর এক জাগ্রত জনতাকে হত্যা করে আসছে। কেননা, এতদিন তারা ছিলো শহরের অভ্যন্তরে। যেখানে তাদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালানো অসম্ভব ছিল। আর এখন তারা সকলেই রাস্তায় নেমে আসায় খুব সহজেই তাদের হত্যা করা যাচ্ছে। তবে যতই নির্যাতন আর হত্যার স্বীকার হোক না কেন, দৃঢ়সংকল্প ও পরস্পরকে সাহায্য করার উচ্চ মনোবল নিয়েই কিন্তু তারা মাঠে নেমেছে।

অপরদিকে জনতার উপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালানো সত্ত্বেও তারা কিন্তু অতি দ্রুতই মনোবল হারিয়ে ফেলছে এবং তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও লাঞ্ছনার ক্ষীণ আওয়াজ অনুভব করছে। প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী জালিমের অবস্থা এমনই। তাদের বাহ্যিক বর্বরতার আড়ালে হীনতা আর কাপুরুষতা লুকিয়ে থাকে। যখন সর্বত্র যুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠে, তখন বিরোধীপক্ষের সৈন্যদের সামনে তাদের এই হীনমন্যতা ও দুর্বলতা প্রভাতের মত উজ্জ্বল হয়ে যায়। যদিও প্রতিপক্ষের সেনাদলকে বাহ্যিকভাবে খুবই দুর্বল ও অল্প সংখ্যক মনে হয়। তাদের আভ্যন্তরীণ সকল শক্তি বিদ্রোহীদের কাছে স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও পরোয়া করে না। বরং শক্তিধর জালিমরাই ভয়ে পলায়ন করে।

আরবের নিরাপত্তাবাহিনী الشبيحة–البلطجية পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থাকে পাহারা দেওয়ার জন্য একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এটি ল্যাটিন আমেরিকার فرق الموت তথা ডেথ স্কোয়াড পদ্ধতির অনুকরণে গঠিত। যা সরাসরি আমেরিকান গোয়েন্দাসংস্থার তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এরা আন্দোলনকামী জনতা থেকে দূরে থাকতে ভালোবাসে। তারা সমাজের অন্য সকল মানুষের মত বৈধ ঔরসের ফসল নয়। বরং এরা জাতির উপর পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট দরিদ্রতা এবং চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থার ফসল। এদেরকে তারা রাস্তা থেকে এবং বিভিন্ন ফুটপাত থেকে কুড়িয়ে এনেছে। এরা সম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ওয়াদাপূরণ, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা বলতে কিছুই বুঝে না। তাদের ভিতরে বোঝার ক্ষমতাটুকুও নেই। কারণ, তারা লাঞ্ছনা, অবহেলা, উৎকণ্ঠা-অস্থিরতা, সন্দেহ-সংশয়, ধমক-বিতাড়নের মাঝে বেড়ে উঠেছে। প্রতিনিয়ত ধোঁকা আর প্রতারণার স্বীকার হয়ে আসছে। এদেরকে যারা প্রতিপালন করেছে, তারা জনগণের উপর অন্ধ বিদ্বেষের উপর প্রতিপালিত করেছে। আর যদি তাদের ধারণের প্রক্রিয়া সম্ভব হয়, তারপরেও এটি তার উপযুক্ত সময় নয়। কেননা, তাদের মাঝে দয়া বা সহানুভূতির কোন চেতনা নেই। অপরকে ক্ষমা করার মত মানসিকতাও তাদের মাঝে নেই। তাদের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এবং তাদেরকে সঠিক বুঝ দেওয়ার মত কোন নিকটাত্মীয়ও নেই। অতএব, এদেরকে পরিপূর্ণ দৃঢ় সংকল্পের সাথে প্রতিহত করতে হবে। যাতে করে এরা তাদের ইউনিফর্ম পরিধান করা গোয়েন্দাদের জন্য শিক্ষা হয়ে থাকতে পারে।

আর যখন বিপ্লবীরা সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সরকারী বাহিনীর ঘাঁটি, অফিস, ক্যাম্প ইত্যাদি দখল করার জন্য আক্রমণ শুরু করবে, তখন অবশ্যই তাদেরকে কঠিনভাবে আক্রমণ চালাতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্র নিয়েই মাঠে নামতে হবে। যাতে করে বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের অর্থ-কড়ির শেষ পরিমাণটুকুও লোপ পায় এবং তা ধ্বংস হয়ে যায়। আর আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়দেরকে অবশ্যই তীক্ষ্ণতার সাথে গভীর মনোযোগের সাথে একের পর এক আক্রমণ চালাতে হবে। কারণ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আক্রমণের মোকাবেলা সমপরিমাণ আরেকটি আক্রমণের দ্বারাই হয়ে থাকে। যেন আন্দোলনের মাঝে বিশৃঙ্খলা, অনৈক্য সৃষ্টি না হয় এবং কেউ পিছু হটে না যায়। জনগণের মানসিকতা ও উত্থানকামীদের অবস্থা দেখে মূলত: আক্রমণের কঠোরতা নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর শক্তি প্রয়োগ করে পরিবর্তনের জন্য কঠোর আক্রমণ চালাতে হবে।

### যে কোন ইসলামী বিপ্লবের দর্শন দু'টি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত:

**ক.** রাজনৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়া। যেন মানুষের বিবেকগুলো তাদের কবল থেকে মুক্ত হয় এবং তারা নিজেদের বিবেক দিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে, বিবেচনা করতে পারে, দুনিয়া ও আখেরাতের বাস্তবতা নিয়ে ভাবতে পারে।

**খ.** পূর্ববর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করে দেওয়া। যেন কোন বিপদাপদ, অস্থিরতা, অশান্তি, গন্ডগোল ছাড়াই পরিবর্তনের পথ নিরাপদ হওয়ার নিশ্চয়তা অর্জন করা যায়। আর পূর্ববর্তী রাষ্ট্রব্যবস্থা জোরদারকারী মূল শক্তিকে পরিপূর্ণভাবে ও

বাস্তবিকভাবে ধ্বংস সাধন করা ছাড়া কোন বিপ্লবই সফল হতে পারবে না। চাই তা সশস্ত্র অবস্থায় হোক বা নিরস্ত্র। এমন ধ্বংস, যা বিলাল বিন রাবাহের নীতির অধীনে "সে বেঁচে থাকলে আমি বেঁচে থাকি না" এই বাক্যের শব্দগুলো নির্দেশ করে।

## দ্বিতীয়ত: জনশক্তি তৈরী এবং তাদের মধ্য থেকে সেনা সমাবেশের ধারা অব্যহত রাখা:

যে কোন বিপ্লবের ক্ষেত্রেই প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জনশক্তি, সেনাশক্তি তৈরী করা একটি বিপ্লবের জন্য প্রাণশক্তিতূল্য। চাই তা সামরিক হোক অথবা বেসামরিক। এর থেকে বিরত থাকা বা গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে জনতার উত্থানকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় না। আর যেই দিন থেকে সর্বপ্রথম বিপ্লবের জন্য চিন্তা-ভাবনা বা পরিকল্পনা শুরু হয়েছে এবং মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানো কাজ আরম্ভ হয়েছে, সেই দিন থেকেই বিপ্লবকেন্দ্রিক নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্য ভাবতে হবে, চেষ্টা করতে হবে এবং ধীরে ধীরে তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

বিপ্লবীদের আক্রমণের তোড়ে যখন রাষ্ট্রের পতন হবে, তখন সে তার শক্তি, দাপট এবং বড় বড় ব্যক্তিত্বদেরকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়বে। এ সময় তারা বিদ্রোহীদের মাঝে যারা দক্ষ, বিশ্বস্ত তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী অফিস আদালতের দায়িত্বে নিয়োজিত করার প্রস্তাব দিবে।

এ সব রাষ্ট্রগুলো আন্দোলনকারীদেরকে কোন প্রকার কর্মতৎপরতা চালাতেই দেয় না। যখনই দেশের মধ্যে কোথাও বিপ্লব-বিদ্রোহকেন্দ্রিক আবহাওয়া অনুভব করে, সাথে সাথে বিদ্রোহীদেরকে চিহ্নিত করে; ক্রমান্বয়ে গ্রেফতার, হত্যা কিংবা দেশান্তর করতে এবং বিপ্লবীদের সাফল্য ধ্বংস করতে শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় তা ধ্বংস করতে দেওয়া উচিত নয়। সুতরাং সংঘর্ষে জড়ানোর ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবে না। বরং তাদের হাতে যাতে গ্রেফতার না হয়, এজন্য ফাঁকি দেওয়া এবং অনুপ্রবেশ করার বিদ্যা শিক্ষা করবে।

সেনাবাহিনীর আকিদা-বিশ্বাস ও তাদের অফিসারদের আনুগত্যের ভিত্তিতে বিপ্লবের বিভিন্ন স্তরে একটি বিশেষ বিপ্লবী পদ্ধতি বিদ্রোহীদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যার আকিদা-বিশ্বাস যেমন, সে বিদ্রোহীদের সাথে তেমনি আচরণ করে। বিশেষ করে যখন বিদ্রোহীদের সাথে পূর্ব ঘোষণার মাধ্যমে যুদ্ধ করা হয়। তখন তাদের আচরণগুলো প্রকাশ পায়। তাই যে সেনা সদস্য ভালো আকিদা লালন করা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর মাঝে আছে, সে বিদ্রোহীদের সাথে খুব কম হিংস্র আক্রমণ করে। বরং তাদের অনেকেই অতি দ্রুত সেনাবাহিনীর দল ত্যাগ করে এবং বিপ্লবীদের সাথে যোগদান করে। এই শ্রেনীর সেনাবাহিনী জনপ্রিয় গণজাগরণের পক্ষে উপযুক্ত।

আদর্শিক সেনাবাহিনী, দলীয় মনোভাবাপন্ন সেনাবাহিনী এবং পেশাদার সেনাবাহিনীদেরকে যুদ্ধের জন্য নতুন করে প্রস্তুত করতে হয় না। একইভাবে সরকারী কোন সংগঠনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ, সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি এবং সেসব সেনা সদস্যরা, যাদেরকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা শাসকশ্রেণী নিয়ন্ত্রণ করে, এরা আক্রমণের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করে। সরকারের প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য বিপ্লবী ও উত্থানকামী জনতার বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং অন্যায়-অনাচারে সীমালঙ্ঘন করে।

*তাই একথা উজ্জল সূর্যের ন্যায় স্পষ্ট যে, শান্তিপূর্ণ পন্থায় কখনো এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে না। বরং এদের প্রতি কোনরূপ দয়া না দেখিয়ে ক্ষিপ্রতা এবং কঠোরতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ ও আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। সুতরাং গেরিলা যুদ্ধ বা একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ বিপ্লবী পরিস্থিতি বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর একটি উপায়। যদি শহরের মধ্যে আবদ্ধ থেকেই সহনশীলতার পদ্ধতিতে বিপ্লব চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে তারা কঠোরতার সাথে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে সক্ষম হবে না, মৃত্যু পর্যন্ত পরাধীনতা ও নির্যাতনের স্বীকার হতে হবে, বন্দিরা গৃহহীন হয়ে থাকবে, ইচ্ছাগুলো ভঙ্গ হবে এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কঠিন পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করার মানে হলো: মৃত্যু মুখে পতিত হওয়া এবং যুদ্ধের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংস করা। যা আল্লাহ তা'আলার যে কোন ক্ষুদ্র সৃষ্টিই অনুধাবন করতে পারে।*

বিপ্লবীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে খণ্ড খণ্ড হামলা পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বংস করতে অকুতোভয় করে তোলা, রাষ্ট্রের নির্যাতনের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী করে তোলা, যেকোন সমস্যা ও বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে পরোয়া না করার মানসিকতা তৈরী করা, নিজেদের ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার আদায়ের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি অর্জন করা, নির্যাতনকারী বাহিনীকে আক্রমণ করার অভিজ্ঞতা লাভ করা, অন্তর থেকে তাদের প্রভাব ঝেড়ে ফেলার প্রশিক্ষণ দেওয়া, যেখানেই সুযোগ পাবে, সেখানেই জালিম বাহিনীর উপর হামলে পড়া এবং তাদেরকে শাস্তি দিয়ে অপদস্ত করা। তাদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা। আক্রমণের পরিধি বিস্তৃত করা। আর এসব কিছুর মধ্য দিয়েই উত্থানকামীদের অভিজ্ঞতা ও আক্রমণ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অবশেষে যখন তাদের রাস্তায় বেরিয়ে আসার চূড়ান্ত সময় ঘনিয়ে আসবে, তখন দেখা যাবে যে, জনগণের বিভিন্ন সেক্টর ও উপদল মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা ও দুঃসাহসিকতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

এই স্তরে এসে বিপ্লবকামীরা যেই কাজগুলো করবে, সেগুলোর অন্যতম হলো শান্তিপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করবে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ প্রকাশ করা এবং দলমত নির্বিশেষে সাধারণ জনগণের সমর্থন অর্জন করা। এই উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা যায় সেগুলো হলো: ওয়েবসাইট ও রেডিও-টেলিভিশনে সম্প্রচার করা, গ্রাফিক্সের মাধ্যমে প্রচার করা, বড় বড় সড়ক ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে সাইনবোর্ড-ব্যানার-বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার করা, বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক প্রজেক্ট হাতে নেওয়া, যেমন নাশিদ, কবিতা, ব্যঙ্গাত্মক কৌতুক এবং সাহিত্য প্রকাশ করা, এমন কিছু প্রতীক ও প্রতিচ্ছবি পরিধান করা, যা দ্বারা বিরোধিতা প্রকাশ পায়, আন্দোলনের মধ্যে শহীদ হওয়া বীর-বাহাদুরদের ছবি প্রকাশ করা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও টেলিফোন বিল না দেওয়া, ব্যাংক থেকে সকল অর্থ উত্তোলন করে নেওয়া, কর প্রদান না করা এবং সকল স্তরে গণভোট ও নির্বাচন বয়কট করা।

আরো কিছু উপায় আছে, যা দ্বারা সাহসিকতা ও অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে। যখন চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে দ্বন্দ্ব ও ঘাত-পাল্টাঘাত চরমে পৌঁছবে, তখন সেগুলো ব্যবহার করা যাবে। সেগুলো হলো: সরকারী সহিংসতাগুলোর প্রতিবেদন করা এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মানসিক চাপের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রচার করা। সরকারী অফিস-আদালত এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলোতে সুযোগ পেলেই দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা। দেশে প্রতিদিনের স্বাভাবিক কর্মকান্ডে বিঘ্নতা সৃষ্টি করার জন্য যোগাযোগব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া। তবে এখানে সাধারণ জনগণের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। তাদের যেন কষ্ট না হয়। সরকারকে কষ্টের মধ্যে ফেলা। বিভিন্ন দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে জটিলতায় ফেলা। দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অপকর্মগুলো প্রকাশ করে দেওয়া। রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে কৃত্রিম মকদ্দমা দায়ের করা এবং তাদের উপর জরিমানা আরোপ করা। এমন কিছু প্রতিষ্ঠান ও মন্ত্রণালয় তৈরী করা, যেগুলোর মাধ্যমে সরকারী মন্ত্রণালয় ও অফিস আদালতকে চ্যালেঞ্জ করা হবে, ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করানো হবে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে অধিক পরিমাণে লোক সমাগম করতে হবে। চাই তা পরিসেবা প্রতিষ্ঠান হোক বা অর্থ মন্ত্রণালয় হোক বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হোক।

আর আন্দোলনকামীদেরকে অবশ্যই সরকারকে সদা সর্বদা ব্যস্ত রাখার জন্য প্রতিনিয়ত নিত্য নতুন কিছু না কিছু আবিষ্কার করতে হবে। যাতে সরকার দৈনন্দিন নতুন নতুন পরিস্থিতির স্বীকার হয় এবং সেগুলোর সাথে নিজেরদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে না পারে এবং দমন করতে না পারে।

## তৃতীয়ত: সময়:

বিপ্লবকামীরা শক্ত অবস্থান তৈরী ও শক্তিশালী হওয়ার পূর্বেই সরকার যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে নির্মূল করতে চায়। অপরদিকে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য হলো: শত্রুর শক্তিকে নিঃশেষ করে দেওয়া, তাদেরকে সমূলে নির্মূল করা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, দেশীয় অর্থনীতি ও স্বাভাবিক গতিবিধিকে হুমকির মুখে ফেলা এবং সঙ্কটময় করে তোলা। যার ফলে শাসক সমর্থকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তাদের মাঝে আভ্যন্তরীণ ফাটল সৃষ্টি হবে। সুতরাং তাদের ভয়াবহ দমনমূলক ক্রিয়াগুলো ভিতরের এবং বাহিরের মিত্রদের জন্য মানসিক

বোঝা তৈরী করে এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারায় ও বোকামির দরুন তাদের সমর্থক ও জাতির কাছে ঐতিহাসিক দায়ভারের সম্মুখীন করে। শাসনব্যবস্থাকে অচল ও পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছাতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়াকে কাজে লাগাতে হবে। এছাড়াও সময়ের দৈর্ঘ্যতা সম্পদ ও প্রকল্পের মালিকদের শঙ্কিত করে। যেমনটি বলা হয়ে থাকে যে, কাপুরুষ বিনিয়োগকারীরা সঙ্কটের সময় পলায়ন করে এবং সুরক্ষার সময় অগ্রসর হয়।

বিপ্লবীরা বিপ্লবের সময় দীর্ঘায়িত করতে আগ্রহী হয়। কারণ তারা চায় যে, দেশের প্রতিটি জনসাধারণের মস্তিষ্কে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও দাওয়াত গেঁথে যায় এবং সকলের মাঝে চূড়ান্ত পর্যায়ে মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য তৈরী হয়। আর এই ঐক্যের মাধ্যমে বিপ্লবকামীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং পাল্টা বিপ্লবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মানসিকতা তৈরী হয়।

এখানে সময়ের ব্যাপারে মূলকথা হলো: বিপ্লবীদেরকে ভালোভাবে শক্তি অর্জন করার জন্য, চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য এবং জনসাধারণের আস্থা ও সমর্থন অর্জনের জন্য বিপ্লব চলাকালীন সময়ের সদ্ব্যবহার করা।

## চতুর্থত: সামাজিক সংহতি:

দ্বীনের জন্য নিজেকে বিলীন করে দেওয়া, জীবন উৎসর্গ করা এবং নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার মানসিকতা তৈরী করা। আমরা তো এক উম্মাহ তথা এক জাতি, যার সকল সদস্য একটি দেহের মত। যখন সেই দেহের একটি অঙ্গ কোন অসুবিধা বা কষ্টের অভিযোগ করবে, তখন সমস্ত শরীর তার ব্যাথায় ব্যাথিত হবে। এই মর্মে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿الحشر: ٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿الحشر: ١٠﴾

**"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। আর এই সম্পদ তাদের জন্যে, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।"**

**(সূরা হাশর : ৯-১০)**

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿الحجرات: ١٠﴾

**"মু'মিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে- যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"(সূরা হুজুরাত : ১০)**

আল্লাহ তা'আলার পবিত্র এই বাণীগুলোই অবসর সময়ে অন্তরকে জাগিয়ে রাখার মাধ্যম। যা বিপ্লবীদেরকে দৃঢ় করে, তাদের অন্তরে অনুপ্রেরণা দেয় এবং উত্থান চলাকালীন ও তার পরবর্তী সময়ে সামাজিক সংহতির জন্য কাজ করতে মনের মধ্যে উৎসাহ যোগায়। যেমন: আহত ও নিহতদের সেবা করা, খাদ্য, পানি ও জরুরী চিকিৎসা দিয়ে আন্দোলনরত জনতাকে সাহায্য করার পরিকল্পনা করা। যেমনটি আমরা দেখেছি লিবিয়া বিপ্লবের সময়। মায়েরা তখন মুজাহিদদের জন্য খাবার রান্না করে নিতেন। তাঁরা এই কাজটি অনেক কষ্টের সাথে এবং জনগণের অর্থায়নে করতেন। এমনকি আমরা মিশরের বিপ্লবের দিনগুলোতেও লক্ষ্য করেছি যে, রাবা আদাউয়াতে ডাক্তারদের বিশাল একটি অংশ অসুস্থদের চিকিৎসা ও আহতদের সেবায় নিয়োজিত হয়ে পড়েছিলেন। সকল ডাক্তারগণই স্বেচ্ছায় সেখানে গিয়ে সেবা দিয়েছিলেন। এ ধরণের পরিবেশ-পরিস্থিতি সামাজিক সম্প্রীতি ও

সংহতিরই বহিঃপ্রকাশ। যা তাদের দয়া ও উদারতার লক্ষণ। এর মাধ্যমে সকলের মাঝে মানবতার গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যা এক সময় সকলের মাঝে থাকলেও চলমান বিধ্বস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা তা নষ্ট করে ফেলেছে।

এই অবস্থার মাঝে ও ভেলভেট বিপ্লবের মাঝে পার্থক্য লক্ষ্য করুন! যা আমেরিকা ইরাক যুদ্ধের পর ইউক্রেন ও জর্জিয়ার মত অনেক দেশেই ঘটিয়েছে। এসব বিক্ষোভগুলোতে বিদেশ থেকে অর্থায়ন করা হতো। বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও আধুনিক তাঁবু ক্রয় করতে ব্যয় করেছে কয়েক মিলিয়ন ডলার এবং তাদেরকে দিয়েছে পরিপূর্ণ মিডিয়া কভারেজ। যার কোন তুলনা হয় না। আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো দিয়েছে আইনী সহায়তা।

## ৩-নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্মাণ:

ক্ষমতাশীন সরকারের পতনের সাথে সাথে বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা গ্রহণ করে। তখন তাদের **প্রথম দায়িত্ব হলো:** বিপ্লবের বিরোধী ও শত্রুদেরকে চিহ্নিত করে দ্রুত বিপ্লবী বিচারের আওতায় এনে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

**দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো:** আঞ্চলিক সীমানাভিত্তিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, সেগুলোতে বিপ্লবের নীতিমালা ও প্রভাব সৃষ্টি করা। অতঃপর বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তির বার্তা সম্বলিত পত্র প্রেরণ করা। যেগুলোতে বিপ্লবীদের সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া হবে এবং নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া হবে। সাধারণত: বিপ্লবগুলো স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে থাকে। যেহেতু বিপ্লব জনসাধারণের ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। তাছাড়া এটি সামরিক অভ্যুত্থানের চেয়ে ভিন্ন। এই পয়েন্টটি ও তার আগের পয়েন্টের মূলকথা হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লব যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা অর্জিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবকে ইসলামীকরণ করার দ্বারা তেমন কোন ফায়েদা হবে না।

অতএব, মুসলমানদের অবশ্য করণীয় হলো: তাদের পক্ষে কাজ করার জন্য তাদের প্রতিবেশীদের কাছে বিপ্লবের প্রচার করতে হবে। একদিক থেকে বিপ্লব নির্মাণ প্রক্রিয়ায় নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে, অন্যদিক থেকে বিপ্লবের মধ্যে নতুন নতুন মিত্র যোগ করতে হবে।

**তৃতীয় দায়িত্ব হলো:** খুব সতর্কতার সাথে জীবনের স্বাভাবিক গতিবিধি ফিরিয়ে আনা। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সচ্ছলতার প্রতি মনোযোগ দেওয়া। যাতে করে বিপ্লব পরবর্তী দুর্ভিক্ষ থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়। এর পরেই আসবে কিছু ঝুঁকি। যেগুলোতে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে দুঃসাহসী ভূমিকা রাখতে হবে। এ সময় এতটাই তীক্ষ্মতার সাথে কাজ করতে হবে, যাতে কোন পদক্ষেপই ভুল না হয়।

বিপ্লবে সাফল্য অর্জনের পর সরকারপক্ষীয় মিত্রদের মাঝে রাজনৈতিক বিচ্ছেদ ছড়িয়ে পড়বে। তাদের সাধারণ থেকে সাধারণ কর্মসূচিগুলোতে আর তারা একত্রিত হবে না। বিপ্লবের চলাকালীন অবস্থায় এসব পরিস্থিতির অনেক কিছুতেই তারা মাথা ঘামাবে না। তখন তাদের মিত্রদের মাঝে এক শীতল যুদ্ধ শুরু হবে। খুব শীঘ্রই কিছু বাছাই পর্বে তারা ধোঁকাগ্রস্ত হবে। অবশ্য বিপ্লবের কারণে অনেক সময় তার স্বপক্ষীয় লোকদেরও ক্ষতি হয়। তবে অধিকাংশই শক্তি ও সংগঠনের দিক থেকে বিপ্লবের উপর প্রভাব রাখে এবং নিজ আকিদা-বিশ্বাস অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে কাজ করে।

যদি এই নিরব যুদ্ধ ও বাছাই পর্বের সময়টুকু দীর্ঘ হয়ে যায়, তাহলে বিপ্লব নতুন করে কিছু কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। যা খুবই বেদনাদায়ক। তাদের এই আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিতে ও তার ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে মুহূর্তেই খণ্ড-বিখণ্ড করে দিতে সক্ষম এবং প্রতিবিপ্লবীদের সামনে আরেকটি বিপ্লবের পথ খুলে দিবে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেনাবাহিনী এই বিশৃঙ্খল অবস্থাকে কাজে লাগায়। এ সময় তারা সহায়তাকারীর মত ক্ষমতায় অনুপ্রবেশ করে এবং পরক্ষণেই সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

এই স্তরের আরো একটি ঝুঁকি হলো: বহিরাগত হস্তক্ষেপ, আভ্যন্তরীণ নাশকতা, অর্থনীতি ধ্বংস করে দেওয়া, তহবিল লুট করা, ক্যাডারদের আগ্রাসন, আর্থিক ও সামাজিক সঙ্কট তৈরী এবং বিপ্লবের প্রশাসনিক দিক ও পরিচালনা দুর্বল হয়ে যাওয়া। সুতরাং বিপ্লব নেতৃত্বে সাফল্য অর্জন করা রাষ্ট্র পরিচালনায় সাফল্যের প্রমাণ নয়।

এজন্য আন্দোলনের পর নতুন রাষ্ট্র পরিকল্পনায় বিচারকার্য, নিরাপত্তা বিষয়ক, সেনাবাহিনী ও সংবাদকর্মী ইত্যাদি বিষয়ের আমলাতন্ত্র নিশ্চিত করা অতীব জরুরী। একইভাবে সংখ্যালঘু জাতির জন্যও স্পষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে। বিশেষ করে সেই জনগোষ্ঠী, যারা ভিন্ন আকিদা-বিশ্বাস লালন করে এবং বহিরাগত শক্তির প্রভাবে চলে।

সাধারণত: এই নির্মাণ স্তরে কিছু সময়ের জন্য হলেও বিচক্ষণ নেতৃত্ব নিয়োগ করতে হয়। যেন বিপ্লবের জন্য যে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি যথাপোযুক্ত হন। আর এমন যোগ্য ও যথাপোযুক্ত নেতৃত্ব ততদিন অব্যাহত রাখতে হবে, যতদিন নবগঠিত রাষ্ট্র বিপদসীমা অতিক্রম না করে, নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা সুদৃঢ় না হবে, নতুন রাষ্ট্রের নতুন অফিস-আদালত ও মন্ত্রণালয়গুলো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হবে ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সমাজের মানুষদেরকে সচেতন করা, আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত প্রতিরক্ষা মজবুত করা, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা, বহির্বিশ্বের সাথে ধারাবাহিক যোগাযোগ চালু করা ইত্যাদি নিশ্চিত না হবে। এই বিষয়গুলোর নিশ্চিত করার পর একটি নতুন রাষ্ট্র তার স্বাভাবিক রূপ ফিরে পাবে। আর যদি নেতৃবৃন্দের মাঝে নেতৃত্বের এমন গুণাবলী না থাকে এবং রাষ্ট্রের এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে তারা ক্ষমতা আত্মসাৎ করবে, রাষ্ট্রীয় তহবিলকে নিজের করে নিবে। আর আমাদেরকে পুনরায় সেই বর্গাকার শূণ্যটিতে ফিরে যেতে হবে। তাই বিপ্লবের চিন্তাধারাকে সর্বদা সকলের মাঝে চালু রাখতে হবে।

***

## আরব বিপ্লবের কিছু সমালোচনা:

আরব বিপ্লবের মধ্যে বিপ্লবীদের মনের মাঝে আন্দোলনের প্রতি অনাস্থা থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবেই তারা আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল। এছাড়াও তাদের মাঝে আরো নানা বিষয়ে পারস্পরিক মতানৈক্য ছিল। সকলের ঐক্যমতে গৃহিত কোন পরিকল্পনাও ছিল না। আন্দোলন কেন্দ্রিক তাদের যাবতীয় আসবাব-পত্রের সুরক্ষার কোন ব্যবস্থাও ছিল না এবং তাদের নিজেদের জীবনেরও কোন নিরাপত্তা ছিল না। এই বিপ্লব তাদেরকে সর্বশান্ত করে ছেড়েছে। আর এটি সাম্প্রতিক অন্যান্য আরব বিপ্লবগুলোর জন্য একটি বিপদজনক সতর্কতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এছাড়াও আধুনিক কালের অন্য সকল আরব বিপ্লবগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেও আমরা দেখতে পাবো যে, এগুলো হচ্ছে প্রচলিত কিছু গণ-আন্দোলন। যেগুলোর অধিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। যেমন: মিশর ও ইয়েমেন বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। আর কিছু আছে যেগুলো প্রায় ব্যর্থতার পথে। যেমন: তিউনিসিয়ার বিপ্লব। এই বিপ্লবের একটি অংশ পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার মতবাদ ও পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। আরেকটি অংশ সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ নিয়েছে।

এসব বর্ণনা থেকে যেসব আন্দোলনের নেতৃত্বে সংগঠিত কোন তানজীম বা দল নেই, সেগুলোর ব্যাপারে একটি মূলনীতি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। তা হলো: এসব আন্দোলনের জন্য অবশ্যই যোগ্য নেতৃত্ব, সংগঠিত সংগঠন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ আত্মরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আর এই মৌলিক উপকরণটির অভাবের কারণেই আবর বিপ্লব রাষ্ট্রীয় শোষণের নিচে চাপা পড়ে যায় এবং জনসাধারণের আশা নিরাশায় পরিণত হয়। অতএব, যেকোন গণ-আন্দোলনের নেতৃত্বে যদি কোন সংঘবদ্ধ সংগঠনের যোগ্য নেতৃত্ব না থাকে, তাহলে এর অর্থ হলো: হায়েনা বা হিংস্র প্রাণীর সামনে বহুসংখ্যক জনগণের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা। একদিকে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে নেতৃত্বহীন হয়ে অভ্যুত্থান করবে, অপরদিকে সরকার তার শক্তি ও ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জোর চেষ্টা চালাবে। আর এই সুযোগে সুবিধাবাদীরা তাদের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য সরকারের সাথে লিয়াজু করে চলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

পুর্বোক্ত আলোচনা থেকে আমরা যেই সারকথা পাই, তা হলো: আধুনিক আরব বিপ্লবগুলোর উদ্দেশ্যগত দিকটি খুব ভালোভাবেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুর দিকটি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এসব আন্দোলনে সফলতার উপাদানগুলোর মধ্যে অধিকাংশই ছিল না। যোগ্য নেতৃত্ব, আন্দোলনের জন্য যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, নির্দিষ্ট কর্মসূচি, নিরাপত্তা ও শক্তি ইত্যাদির কোনটিই তেমন ভালোভাবে ছিল না।

সুতরাং জানুয়ারীর অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতার নেতিবাচক দিকগুলি বিবেচনা করে কি সেখান থেকে বর্তমান বিপ্লবের (রাবা আল-আদাওয়াইয়ায় নিপীড়নের বিপ্লব) নির্দেশনা নেওয়া হবে এবং সেগুলো দেখে সংস্কার কর্ম পরিচালনা করা হবে?

***

## বিপ্লবের পক্ষ ও বিপক্ষ:

একটি বিপ্লবের দু'টি পক্ষ থাকে। বিপ্লবের মাধ্যমে উভয় পক্ষের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। তাই যখন শ্রমদানকারী সকল শ্রেণীর মানুষ দেশ থেকে বেরিয়ে যাবে, তখন শুধু স্থাবর অস্থাবর ধন-সম্পদের মালিক এবং নেতারা থাকবে। এরা সকলেই কিন্তু বহু সংখ্যক শ্রমিক-কৃষক ও দিনমজুরদের সেবা নির্ভর। যখন শিক্ষাবিদরা বেরিয়ে যাবে, তখন একনায়কত্ব, স্বেচ্ছাচারীতা ও ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিকারীরা থাকবে। হোক তা রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র বা অন্যকোন পদ্ধতির ক্ষমতা। আর যখন সকল ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী ও মূলধনের মালিকরা বেরিয়ে যাবে, তখন সম্পদের একচেটিয়া ও একচ্ছত্র অধিকারীরা থাকবে। অবশেষে যখন সমস্ত জনসাধারণ এবং প্রতিটি জনগোষ্ঠী বেরিয়ে যাবে, তখন থাকবে দখলদার শত্রু বা তাদের নিয়োগকৃত পা চাটা গোলাম সরকার। তবে অদ্ভুত ব্যাপার হলো: আরব দেশগুলোর অধিকাংশ বিপ্লব শেষের স্তরের অন্তর্ভুক্ত। জনসাধারণের চলাচল ছিলো খুবই স্পর্শকাতর, ঝুঁকিপূর্ণ, সতর্কতামূলক। তাদেরকে গভীর মনোযোগের সাথে চলাফেরা করতে হতো। যার মধ্য দিয়ে তাদের উপর বয়ে যাওয়া নির্যাতনের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠতো। তাদের আবেগ-অনুভূতি, স্বাধীনতাপূর্ণ জীবন, সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান ও আনুষ্ঠানিকতার মাঝেও নির্যাতনের ছাপ ফুটে উঠতো। এর মাধ্যমেই স্পষ্ট বুঝা যেত; জবরদখল, সম্পদ আত্মসাৎ ও দেশের ভাগ্যাকাশের উপর অবৈধ দখলদারিত্বের বাস্তবতা। ওরা সেই দেশেই সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দখলদারিত্ব স্থাপন করতো। যারা ছিলো পাশ্চাত্য শক্তির সেবাদাস। অন্যদিকে সেই দেশেরই পশ্চিমাদের অনুগত সামরিক ও রাজনৈতিক বড় বড় ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে সম্পদ আত্মসাৎ করতো।

***

## আন্দোলনের নেতৃত্ব:

বর্তমান শতাব্দীতে বিপ্লবগুলো একটি সন্দেহপূর্ণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। যা বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ও শেষার্ধে হয়েছিল। তবে উভয় শতাব্দীর আন্দোলনের মাঝে চিন্তাগত, নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার দিক থেকে অনেকখানি পার্থক্য আছে। গত শতাব্দীতে অধিকাংশ বিপ্লবে সামরিক নেতৃবৃন্দ নেতৃত্ব দিয়েছিল। যা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের শক্তির সহায়তায় পরিচালিত হতো। বাস্তবে সবগুলোই সামরিক অভ্যুত্থান ছিল। মোটেও বিপ্লব ছিল না। তাছাড়া এসব বিপ্লবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দায়িত্বহীন, স্বৈরাচারী, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের সেবাদাসী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আরো একটি বাস্তব বিষয় হলো: পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আজ যেসব অকেজো ও ব্যর্থ দোসরদের নিয়ে কাজ করছে, অচিরেই তারা নতুন কিছু অনুসারীর আমদানি করে এদের থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। বিগত শতাব্দীতে বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের অবস্থা বাস্তবে এমনি হয়েছিল। হয়তো তারা শক্তিশালী পশ্চিমাদের সেবাদাস ছিলো, না হয় প্রাচ্যবিদদের সেবাদাস ছিলো। অত:পর তাদের সাথে উক্ত আচরণই করা হয়েছে। আর তারা তাদের এমন উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতো স্বদেশী কিছু সেনা সদস্যদের মাধ্যমে। যারা পরিপূর্ণরূপে তাদের আনুগত্য করে চলতো। যা কিছুই ঘটেছে, তার সব কিছুই মূলত: জনগণের বিপ্লব ছিল না। বরং এটি ছিলো আধুনিক উপনিবেশবাদের দেশগুলিতে একটি অভ্যুত্থান। এগুলোর নেতৃত্ব উপনিবেশবাদীদের কর্মচারী এবং জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী লোকদের হাতে দেওয়া হতো।

আর বর্তমান শতাব্দীর অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জনগণ অনেক কিছুতেই পরিপক্ক হয়ে গেছে। তাদের মাঝে ধর্মীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ছড়িয়ে পড়েছে। তারা রাজনৈতিক ও সামরিক অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এ থেকে তাদের আগ্রহ-উদ্দীপনা ও চেতনা জাগ্রত হয়েছে। ফিলিস্তীন সঙ্কট ও আরব যুদ্ধসমূহ, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দুর্দশা, দীর্ঘমেয়াদি আফগান যুদ্ধ, ইরান বিপ্লব, কাশ্মীর ট্রাজেডি, বিভিন্ন ইসলামী জাগরণ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, জিহাদী সংগঠনসমূহ, ইরাকে আমেরিকার প্রথম আক্রমণ, সোভিয়েতের পতন, বার্লিনের প্রাচীর ভাঙ্গা, মধ্য এশিয়ার মুক্তি এবং এর আভ্যন্তরীণ বিপ্লবগুলি, সোমালিয়ায় আমেরিকার আক্রমণ ও সেখান থেকে বিতাড়ন, মুসলমানদের উপর বৌদ্ধ ও হিন্দুদের হত্যাযজ্ঞ, ইয়েমেন যুদ্ধ, আলজেরিয়া ও ফিলিস্তীনের নির্বাচন, উপসাগরীয় অঞ্চলের অর্থ লুট এবং উম্মাহর শত্রুদেরকে সমর্থন, তৈমুরের বিচ্ছিন্নতা, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার জিহাদ, পৃথিবীর বড় শক্তির দাবিদারের উপর আল-কায়েদার আক্রমণ, এরদোগানের তুরস্কে সামরিক নিয়ন্ত্রণের পতন, আফগানিস্তান ও ইরাকে ইসলামের উপর আমেরিকার যুদ্ধ এবং সুদান বিভক্তি ইত্যাদি এমন আরো যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, এসবগুলোর অভিজ্ঞতা মানুষের মাঝে স্বাধীনতা, শক্তি এবং অধিকার আদায়ের আন্দোলনের জন্য বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তুলেছে। বিগত শতাব্দীতে উপনিবেশের এজেন্টদের পতন ঘটানোর জন্য এবং এর সাথে সাথে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, কলুষিত স্বভাব-চরিত্র ও কৃষ্টি-কালচারকেও ধ্বংস করার জন্য মানুষের মাঝে বিপ্লবী মানসিকতা তৈরী হয়েছে। ঔপনিবেশীকদের ছড়ানো নোংরামীগুলোকে সমূলে ধ্বংস করার, স্বাধীনতার জন্য কাজ করার, দেশের অগ্রগতি ও উন্নতি সাধন এবং নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে জলাঞ্জলি দিয়ে অন্যের অধীনতা মেনে না নেওয়ার মানসিকতা জেগে উঠেছে জনমনে।

***

তবে দুঃখের বিষয় হলো- তাদের এই উন্নত ও সৃষ্ট মানসিকতার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন এখনো সম্ভব হয়নি। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো: তাদের মাঝে এখনো এমন কোন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়নি, যে তাদেরকে ঐতিহাসিক নেতৃত্ব দিয়ে সামনে এগিয়ে নিবে। তাই স্বদেশের পুরোনো প্রজন্মের সাথে তাদের একটি অংশ একিভূত হয়ে গেছে। আরেকটি অংশ বহিরাগতদের সাথে সন্দেহাতীতভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে। যেমন অনেকেই সেক্যুলারদের স্রোতের সাথে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এমনকি তাদের মাঝে চিন্তাগত পার্থক্যও সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ার পরেও তাদের মাঝে পারস্পরিক ভিন্নতা, বৈপরিত্য এবং শত্রুতার বীজ রোপিত হয়েছে। মিশরের সামরিক বিপ্লবের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আন্দোলনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ঝগড়া ও বিশৃঙ্খলা থেকে সামরিক গোষ্ঠী ফায়দা হাসিল করেছে। লিবিয়ায় বিদ্রোহীদেরকে ও সেনাবাহিনীকে নির্মূল করার পর পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মাঝে বিভাজন হয়েছে। অতঃপর তা সামরিক বিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। একইভাবে তিউনিসিয়ায় বিভ্রান্তি, জটিলতা সৃষ্টি হয়ে আছে। ইয়েমেনের মধ্যে সৌদি আরবের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রভাব চলছে। সিরিয়ায় তো এখনো যুদ্ধ চলছে।

সংক্ষেপে বলতে গলে-

১. বর্তমান শতাব্দীর আন্দোলন, বিপ্লব ও উত্থানগুলো যোগ্য নেতৃত্বহীন।

২. এর ফলে চিন্তাগত দিকটির মধ্যেও ব্যাপক ভিন্নতা চলে এসেছে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে দুই পক্ষের কেউ না কেউ ব্যর্থ হয়েছে।

৩. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কারসাজি করেছে। আর এর মূলে ছিলো সামরিক কাউন্সিল।

৪. আরো ছিলো বিপ্লব কেন্দ্রিক তাদের আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোটগুলো।

এই চারটি পয়েন্টের সাথে বিপ্লবগুলো একটি নতুন যুদ্ধে প্রবেশ করেছিল। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: তারা তাদের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছে। যেমনিভাবে তারা তাদের শত্রু ও শত্রুদের কার্যপদ্ধতি বুঝতে সক্ষম হয়েছে। এটিই হচ্ছে সফলতার পয়েন্ট। যা থেকে নতুন বিপ্লব শুরু করা উচিৎ। যা অচিরেই সামান্য কালের বিবর্তনে সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ নিবে, ইনশাআল্লাহ।

## বিপ্লবে সফলতা ও ব্যর্থতার কারণসমূহ:

আমরা যদি বিপ্লবকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই দু'টি বিষয় বাস্তবায়ন করতে হবে।

১. পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটানো।

২. নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন।

## বিপ্লবে সফল হওয়ার উপাদানসমূহ:

চলমান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি জনগণের অসন্তুষ্টি, পরিবর্তনের আশা হারিয়ে ফেলার সাথে সাথে জনসচেতনতা লোপ পাওয়া, জনগণের আশার সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা বিদ্যমান থাকা, বিপ্লবের (কেন্দ্রিয়, গ্রুপ ভিত্তিক ও দল-উপদল ভিত্তিক) নেতৃত্ব বিদ্যমান থাকা, যারা আন্দোলন কেন্দ্রিক বিভিন্ন বিষয় চিন্তা করে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে এবং জনগণকে একত্রিত করে সুষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে সামনে এগিয়ে নিতে পারবে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করার পর নতুন রূপরেখা ও পদ্ধতি অনুযায়ী দেশকে পরিচালনা করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন লোক থাকতে হবে।

কোন আন্দোলনের মাঝে যদি এসব উপাদানগুলো না থাকে, তাহলে তা ক্রমেই বিশৃঙ্খলা ও ব্যর্থতার দিকে ধাবিত হতে থাকবে। এমনকি যদি তারা পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে সক্ষমও হয়, কিন্তু তারা নতুন রূপরেখা অনুযায়ী রাষ্ট্রকে গঠন করতে পারবে না।

## বিপ্লবে ব্যর্থ হওয়ার কারণসমূহ:

এমন কিছু ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, যা নেতৃত্বের শক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। যথাযথ পরিকল্পনার না থাকা, যার উপর ভিত্তি করে নতুন রাষ্ট্র গঠন করা হবে। ক্ষমতা নিয়ে আন্দোলনের বিভিন্ন পক্ষের মাঝে বিরোধ লেগে থাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে ঝগড়া শুরু করা। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস না করা। চলমান বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নেওয়া এবং সেনাবাহিনী আরেকটি প্রতিবিপ্লব করার সম্ভাবনা থাকা। মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের সাথে খেলা করা এবং জনসাধারণের ঐক্যের মাঝে ফাটল ধরিয়ে দেওয়া। প্রতিবিপ্লবীরা আন্দোলনের শক্তি ও ঐক্যের মধ্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হওয়া।

বিপ্লব পরবর্তী সময়ে বিপ্লবকামীরা তাদের পরবর্তী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবে। কিন্তু এ সময় তাদের মাঝে পুরাতন সরকারের পক্ষে বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ও অনুপ্রবেশ করলে বিপ্লবীরা তাদের উদ্দেশ্যপানে অগ্রসর হতে সক্ষম হবে না। এই অবস্থায় ক্ষমতাশীন দলটি পাল্টা সহিংসতা ছড়াতে শুরু করে, বিপ্লবের ফলাফলকে বিনষ্ট করতে চায় এবং দেশের উন্নয়নকে থামিয়ে দেয়ার লক্ষ্য স্থির করে। এতকিছু সত্ত্বেও তারা জনগণের কিছু চাহিদা পূরণ করে এবং জনগণের পক্ষে কিছু কথা বলে তাদের কাছে আশ্রয় পেতে চায়। তবে যেসব ক্ষেত্রে তারা বুঝতে পারে যে, এসব করে জনগণের কাছে কোন ঠায় পাওয়া যাবে না, সেসময় তারা এমনটা করে না। তখন তারা কৌশল অবলম্বন করে স্বয়ং বিপ্লবীদের রীতিতে চলে তাদের কাবু করতে চায়। বিপ্লবীরা তাদের নতুন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে থাকে। এরই মাঝে বাহ্যিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহায়তায় পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুসারী সংগঠন ও সংস্থাগুলো পাল্টা বিপ্লবের আয়োজন করতে চায় এবং নতুন রাষ্ট্র গঠনের সময় তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। কৌশলগতভাবে বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিতে চায়। পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। যদি বলি যে, একটা বিপ্লব মূলত: দেশকে উন্নতির উচ্চ শিখরে এবং নতুন এক ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যায়, তাহলে এটাও বলতে হবে যে, একটি পাল্টাবিপ্লব দেশকে তার সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোতে প্রাবহিত করে এবং পুরো বিপরীত দিকে নিয়ে যায় ও কঠিন অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়।

ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে সফলতা অর্জন করতে হলে কয়েকটি বিষয়ে সফলতা অর্জন করতে হবে। তা হলো: ঔপনিবেশিকদেরকে ও তাদের দেশীয় বেতনভোগী দোসরদেরকে বিতাড়িত করতে হবে এবং তাদের ক্ষমতাকে অকেজো করে দিতে হবে, এমন এক নতুন রাষ্ট্র গঠন পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, যা দ্বারা দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে, নতুন করে কোন ঔপনিবেশিকের কবলে পড়া থেকে দেশকে রক্ষা করার সকল উপায় থাকবে। যাতে করে কোন ধরণের ছদ্মবেশ ধারণ করে পুনরায় কোন ঔপনিবেশিক প্রবেশ করতে না পারে। চাই তা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামরিক বা অন্য যেকোন পন্থায় হোক না কেন।

পুরাতন নষ্ট ও ভ্রষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর বিজয় লাভ করতে হলে কতগুলো বিষয় লক্ষ্যণীয়। তা হলো: দেশের সকল বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবকে নির্মূল করে তাদের শক্তি নষ্ট করে দিতে হবে এবং তাদের পুরাতন রাষ্ট্র পদ্ধতিকে ভেঙ্গে দিতে হবে। নতুন রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তন করা এবং সূক্ষ্ম চিন্তার সাথে একটি নতুন রাষ্ট্রের জন্য উপযোগী করে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তৈরী করা। সমাজের বিভিন্ন গোত্র-গোষ্ঠি ও দল-উপদলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার মাধ্যমে সদ্যপ্রাপ্ত বিজয়কে নিরাপদ করা। এর ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক যেকোন আক্রমণ থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যাবে এবং জনসাধারণের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও আগ্রহের কাঙ্খিত উন্নতির দিকে দেশ ও জনগণ এগিয়ে যাবে। আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী সামরিকবাহিনী ও কর্মীবাহিনী প্রস্তুত করে তোলা। যদি শক্তি-সামর্থে ওদের সেনাবাহিনীর সমান নাও হয়, তবে তাদের কাছাকাছি হতে হবে। যারা হবে আন্দোলনের নেতাদের অনুগত এবং পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থার পাহারাদার সেনাবাহিনীর ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে যেকোন সময় তাদের মোকাবেরা করতে প্রস্তুত থাকবে। এই পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা ছাড়া কখনো কোন বিপ্লব সফল হতে পারবে না। বরং এই বিষয়গুলো নিশ্চিত না থাকলে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনা রয়ে যাবে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: বিপ্লবীদের সামরিক শক্তির মাধ্যমে শত্রুদের সহায়তায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং তাদের সাথে মৈত্রিচুক্তিতে আবদ্ধ বড় ধরণের সকল সেনা শক্তিকে জরুরী ভিত্তিতে অপসারণ করতে হবে। প্রয়োজনে আন্দোলনের অন্যান্য কর্মীদের মাধ্যমে তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সহায়তা দেওয়া যেতে পারে।

***

## বিপ্লব সংক্রমণ

ঐতিহাসিক বাস্তবতা হলো: বিপ্লবগুলো সংক্রমণ দ্বারা ছড়িয়ে পড়ে। এমনটি ইউরোপে, এশিয়া মহাদেশের চিনে, ল্যাটিন আমেরিকা কর্তৃক আরব রাষ্ট্রগুলিতে ঘটেছিল। তাই যখনই কোন দেশে বিপ্লব শুরু হয়, তখন পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মাঝেও এর বৈরী প্রভাব পড়ে এবং সেখানেও বিপ্লবের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যখন প্রতিবেশী দেশগুলোর অবস্থাও আন্দোলনরত দেশের মত হয়।

আর বিপ্লবের সূচনার ধরণের পরিবর্তের কারণে বিপ্লব সংক্রমণের ধরণও পরিবর্তন হয়। তাই সূচনার ধরণে ভিন্নতার কারণে পার্শ্ববর্তী এমন দেশেও বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে, যেদেশে এখনও বিপ্লব শুরু হওয়ার মত কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং যখন কোন দেশে বিপ্লব শুরু হয়, তখন বাস্তবতার সাথে মিল থাকার দরুন তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোও সংক্রমিত হওয়াটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

## বিপ্লব সংক্রমণের প্রতিরোধ করা:

একটি দেশে বিপ্লব শুরু হলে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রকেও ভোগান্তিতে পড়তে হয়, সেখানেও বিপ্লব পরিস্থিতি সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণে। বিশেষ করে যখন উভয় দেশে বিপ্লবের ক্ষতি ও বিপদাপদ একই ধরণের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এসব দেশগুলো সদ্য ধ্বংস হওয়া রাষ্ট্রব্যবস্থার পাশে থাকতে চায়, বিপ্লবকে প্রতিহত ও দমন করতে তাদেরকে সহায়তা করতে আগ্রহী হয়, তাদেরকে অস্ত্র ও অর্থ দেয়, ভূমি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে ও মিডিয়ায় প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের পাশে থাকে। এজন্যই আপনি দেখতে পাবেন যে, সৌদি আরব, আরব আমিরাত ও ইহুদীরা মিলে একে অপরকে আঞ্চলিক সহায়তা দেওয়ার জন্য জোট করেছে। অতঃপর তারা অস্ত্র, অর্থ ও রাজনৈতিকভাবে সহায়তা দিয়েছে। বরং এদের অনেকে তো আন্দোলনকে দমানোর জন্য এবং মিশরের হুসনি মোবারকের শাসনব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য অন্যদেরকে আকাশ পথ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে। বর্তমানে এই কাঠামোর প্রধান হলো সৌদি আরব। এমনকি তার একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথায় সিসি সরকার বস্তুগত সহায়তা পাওয়ার এবং সদ্য বিচ্ছিন্ন হওয়া পশ্চিমাদের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করার আশ্বাস পেয়েছে। এভাবেই মিত্রবাহিনীর রহস্য খুলে দিতে বিপ্লবগুলোকে পদক্ষেপ নিতে হবে। সুতরাং সৌদি সত্তার পেছনে থেকে কি মুসলিম উম্মাহ ফিলিস্তিন ইস্যুতে কোন স্পষ্ট অবস্থানের আশা করতে পারে? তারা সাদাতের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণে এবং প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছে। অতপর তারা প্রতিশ্রুতি দেয় এবং উদ্যোগ গ্রহণ করে। যার শীর্ষে রয়েছে ফিরআউনের বংশধর রিয়াদ গভর্নরের উদ্যোগ।

***

## উপসংহার:

বিপ্লব চলাকালীন সময়ে যুদ্ধের মতই আক্রমণ, ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যা ইত্যাদির ঘটনা ঘটে থাকে। যার ফলে একটি দেশ অনেক বিপর্যয় ও ট্র্যাজেডির সম্মুখীন হয়। এসব কিছু সত্ত্বেও কঠোরতার ক্ষেত্রে যুদ্ধের চেয়েও বিপ্লবের মধ্যে বেশী ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা হয়। (তবে প্রতিবিপ্লবের বিষয়টি ভিন্ন। সেখানে অনেক বেশী পরিমাণে বেইনসাফ ও দমন নিপীড়নমূলক কঠোরতা প্রয়োগ করা হয়।) কারণ একটি বিপ্লবের লক্ষ্য হলো: মানুষকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বা দেশীয় নিপীড়ন থেকে মুক্ত করা। আর তা তখনই গ্রহন করা হয়, যখন বিপ্লব ছাড়া পরিত্রাণের অন্যান্য সমস্ত সুযোগ ব্যর্থ হয়। কিছুটা সহিংসতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তাগিদে, দেশ ও জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পথ রুদ্ধকারীদের প্রতিহত করতে এবং জনগণকে স্বাধীন সম্মানজনক ভবিষ্যত ও উন্নত জীবন অর্জনে সহায়তা করার জন্য বিপ্লব তার স্বগতিতে চলতে থাকে।

পৃথিবীর সকল বিপ্লবই সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সকল অঙ্গনে বিশাল আকারে কার্যকারী ভূমিকা রেখেছে। বহু জাতিকে গোলামী ও অবিচার থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং তাদেরকে তাদের ভবিষ্যত নির্মাণে অংশীদার করেছে।

***

## মিসর বিপ্লবের পর্যালোচনা :

বিপ্লব জনগণের কাছে পরিবর্তনের মাধ্যম, সেনাবাহিনীর কাছে নয়। সেনা অভ্যুত্থান সেনাবাহিনীর কাছে পরিবর্তনের মধ্যম, জনগণের কাছে নয়। সেনাবাহিনী যখন ক্ষমতা দখলের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তারা যুদ্ধাবস্থায় চলে যায়, বিপ্লবের অবস্থায় নয়। এমনিভাবে তারা যখন জনগণের দিকে বন্দুকের নল ঘুরায়, তখন ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতা হারানোর অবস্থায় চলে যায় এবং মানসিক ও সামরিক অভ্যুত্থানে জড়িয়ে যায়। বিপ্লব স্বভাবত জনগণের দাবী-দাওয়া, চাহিদা ও আশা-আকাঙ্খা পূরণ করে। আর সেনা অভ্যুত্থান জনগণকে দমন-পীড়ন করে ও তাদের স্বপ্ন ধ্বংস করে দেয়। বিপ্লবের দর্শন হচ্ছে, জনগণের মৌলিক বিশ্বাস ও চাহিদানুযায়ী তাদেরকে ইসলামী শরীয়াহ ও স্বাভাবিক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর সেনা অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ স্বৈরাচারী আবেশ এবং বৌদ্ধিক অসঙ্গতি অনুসারে এই অভ্যুত্থান ঘটানোর মাধ্যমে দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যায়। স্বভাবতই

বিপ্লবের সহিংসতার চেয়ে সেনা অভ্যুত্থানের সহিংসতা বেশী ও জঘন্য হয়ে থাকে। সেনা অভ্যুত্থানের পরে তাদের সহিংসতা সাধ্যের বাহিরে চলে যায় এবং এতটাই জঘন্য হয় যে, সারা দেশে রক্তের বন্যা বয়ে যায়। জনগণের ইচ্ছাশক্তিকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য তারা মন্দ উপায় গ্রহণ করে। বিপ্লবগুলোতে অপরাধীদের বিচারের জন্য তাদের আদালত ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠত থাকে। আর সেনা অভ্যুত্থানগুলোতে তাদের আদালত ভুল অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার করে থাকে। যেখানে কোন সমতা, যুক্তি-প্রমাণ ও সঠিক সাক্ষী থাকে না। বরং শুধু কঠোরতা ও সহিংসতা থাকে। সেনাবাহিনীর পক্ষে কখনো জনগণকে আত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়া সম্ভব না। জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা সেনাবাহিনীর নেই। তাদের ধ্বংসের পরিসংখ্যান করলে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাদের দ্বারা জনগণের উন্নতি সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ইসলামী বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ জনগণের রাজনৈতিক, শিক্ষামূলক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক মৌলিক প্রয়োজন ও দাবীগুলো পূরণ করতে সক্ষম এবং দেশের উন্নয়নে সচেষ্ট রয়েছে। যখন সেনা অভ্যুত্থানের মাঝে প্রতিবিপ্লবের কিছু কারণ বিদ্যমান থাকে, তখন সেই অভ্যুত্থান দেশের মধ্যে রক্ত নদী বয়ে আনে এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিঃস্বঙ্গতা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিপর্যয় নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সামাজিক বন্ধন ও দেশের মৌলিক কাঠামোকে ভেঙ্গে এক ঐতিহাসিক বিপর্যয় নিয়ে আসে। কখনো তা বিবাদমান একাধিক ছোট ছোট রাষ্ট্রের রূপ নেয়। একপর্যায়ে তাদের বিচ্ছিন্নতা সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং বিশাল জোট এবং ইউনিয়নে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মিশরে ২৫ জানুয়ারীর আগে ও পরে কী ঘটেছে? এ প্রশ্ন আমাদেরকে আরেকটি প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়। তা হচ্ছে, সেখানে কি বিপ্লবের দিগন্তে সকল ভূমিকা বিদ্যমান ছিল? যদি না থাকে, তবে দেশের রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক নেতৃবর্গ সে বিপ্লবকে পরিপক্ক হওয়ার আগেই ব্যর্থ করে দিবে। যেমনটা হুবহু ঘটেছিল গত শতাব্দীর ১৯৫২ সালের ২৩ জুলাইয়ের সেনা অভ্যুত্থানে। নাকি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বই তিউনিসিয়ার বিপ্লবের সংক্রামনের পরিবেশ থেকে সূচিত বিপ্লবের ভূমিকা দ্বারা উপকৃত হতে চেয়েছিল? যার ফলে তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিপ্লব করে বসে। অতঃপর সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব বিপ্লবী রেখায় প্রবেশ এবং তার উপর অভিভাবকত্ব চাপানোর পর যা ঘটে ছিল, তা হলো: বিষয়টি তাদের সকলের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং কর্তৃত্ব থেকে বের হয়ে যায়। তারপর বিপ্লব ও তার কর্মীদের নিয়ে তামাশা করা, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করা থেকে রক্ষা করা, বিপ্লব ময়দান থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া, তারা তালমূদ(ইহুদী আইনের সংগ্রহ) থেকে যা উদ্ভাবন করেছিল, তা নিয়ে তামাশা করা, যাকে তারা 'সংবিধান' হিসাবে নামকরণ করেছিল। নির্বাচন ও গণভোটে জনগণের সাথে প্রতারণা করা, দুর্নীতিবাজদের ক্ষমা করে দেওয়া ও সৎ মানুষদের সাথে শয়তানী আচরণ করা। এসব কিছু বিষয় আমাদেরকে এটা জানার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যে, রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে ২৫ জানুয়ারীর আগে এবং পরে কী হয়েছিল?!!

মিসর বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার প্রধান দু'টি কারণ হলো:

১. মুসলিম জনতার মাঝে চিন্তাগত ঐক্য না থাকা এবং এমন কোন নীতিমালা না থাকা; যেগুলো মতানৈক্যের সময় সবাই অনুসরণ করবে। ফলে বিপ্লবীদের ভিতর থেকে অনৈক্য বাড়তে থাকে। ফলে বাস্তবতা এমন কঠিন হয়েছে যে, সকলেই চেতনাগত গোলকধাঁধাঁয় পড়ে যায়, যার গলিতে বিপ্লবীরা হারিয়ে যায়।

২. বিপ্লবকে সংগঠিত এবং আন্দোলিতকারী নেতৃবৃন্দের উদ্যমতা হারিয়ে যাওয়া। অথচ বিপ্লবের প্রধান যুক্তিই ছিল প্রকৃত নেতৃত্ব তৈরি করা। আবু ইসমাইল প্রতীকের ন্যায় সবার শীর্ষে অবস্থান পায়। সে অনেক বিতর্ক উসকে দেয়। বিপ্লবীদেরকে অনেক অনুপ্রেরণা দেয় এবং অনেক অপেক্ষমান জনতাকে অস্থিরতায় ফেলে দেয়। ইখওয়ানুল মুসলিমীন সাময়িক গ্রহণযোগ্যতার সম্ভাবনা নিয়ে সংগঠনের রুপ নেয়। অপরদিকে একজন প্রকৃত নেতার কাছে আন্দোলনকে সোপর্দ করার লক্ষ্যে বিপ্লবী যুবকদের মধ্য থেকে দৃঢ়প্রত্যয়ী হাজেম আবু ইসমাইলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তবে তিনি এমন একটি পরিচয়ে সকলের কাছে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যা আন্দোলনে তার অংশীদার মুসলিম বন্ধুদেরকে এবং ধর্মনিরপেক্ষ মিত্রদেরকে সমন্বয়ে বাধ্য করে। সুতরাং বন্ধু শত্রু সকলেই তার মিত্রতায় অংশগ্রহণ করে। ফলে বহির্শক্তি ও রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মাঝে এবং অন্যান্য

ইসলামিক ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদি দলগুলোর কাছে সংগঠিত হওয়া মৈত্রিচুক্তি ধ্বংস হয়ে যায়। আজ আবার নতুন করে বিপ্লবের পরিবেশ ফিরে এসেছে। তাই তাদেরকে খুবই সতর্ক হতে হবে এবং এই বিশাল গ্যাপগুলো বন্ধ করতে হবে।

প্রধান কারণগুলোর মাঝে আরো একটি কারণ হলো: রাষ্ট্র নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা না থাকা। সাধারণ জনগণ চলমান রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে একটি স্বাধীন ও ন্যায়পরায়ন সমাজ গড়ে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে চায়। সেটা কিভাবে হবে? ইসলামী কর্মশালার মাধ্যমে নাকি ধর্মনিরপেক্ষ বা উদারনীতির কর্মশালার মাধ্যমে? এখানে এসে তাদের আন্দোলন গোলকধাঁধাঁয় পড়ে যায় এবং আন্দোলনের আগে ও পরের বিষয়গুলোর মাঝে যাচাই বাছাইয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়। উদারপন্থী, গণতন্তবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী ও জামাল নাসের-বাদীরা আন্দোলনের কোলে জায়গা করে নেয়। যার কারণে আল্লাহ ছাড়া জনগণের কোন সহায় থাকে না। আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন আশ্রায়স্থল এবং ভরসাস্থল থাকে না। তাই তারা আল্লাহ তা'আলার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং তাঁর উপরই ভরসা করে। অবশেষে তারা ইসলামী জাগরণের মাঝে ফিরে আসে।

কিন্তু আন্দোলনকে নিরাপত্তা দেওয়ার সে সময় ততক্ষণে গড়িয়ে গেছে। উপযুক্ত পরিবেশ চলে যাওয়ার পর তা আর ফিরে আসেনি। জনগণকে একটি বা দুইটির বেশি শহরে জমায়েত করা যায়নি। এ অবস্থায় একমাত্র সমাধান ছিল দেশের সর্বত্র ধর্মঘট অবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া। দেশব্যাপী সকল জনতাকে বিদ্রোহের ডাক দেওয়া। কিন্তু একটি চতুর্থ প্লাটফর্ম আন্দোলনের অনেক চিন্তা চেতনাকেই শিথিল করে দেয়। তাই এর বাস্তবায়নেও ধীরগতি চলে আসে। ফলে আন্দোলনকে সফল করতে তারা ঈমানী মেহনত এবং বিভিন্ন আলোচনা উৎসবে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে: দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবজ্ঞা করা। যার শীর্ষে রয়েছে দূর্নীতিবাজ বিচার বিভাগ। যা বিপ্লবীদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎখাত করার মধ্য দিয়ে তার আইনি তামাশার প্রয়োগ করে বিপ্লবী অভিজ্ঞতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের তামাশার চেয়েও আরো মন্দ ব্যাপার হল, বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ তাদের সেসব সিদ্ধান্তগুলোকে প্রত্যাখ্যান ও ধ্বংসসাধন করার পরিবর্তে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর গুন্ডাদের থেকে প্রত্যেক দুষ্ট ও কুখ্যাত লোকদেরকে নির্মূল করার পরিবর্তে গা ঢাকা দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিচার বিভাগ অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিয়েছে এবং নিরাপরাধ লোকদেরকে বন্দি করেছে। এর চাইতে আরো মন্দ ও জঘন্য ব্যাপার হলো: বিপ্লবীরা তাদের নেতাদের এসব নিকৃষ্ট ও লাঞ্ছনাকর সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে।

সর্বপ্রথম যখন বিচার বিভাগের আসল রূপ প্রকাশিত হলো, তখন এই ভারী ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে বিপ্লবীদের জন্য আবশ্যক ছিলো, তাদের ইসলামী উত্তরাধিকার থেকে আবির্ভূত শরয়ী বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং বর্তমান বিচার বিভাগকে পুড়িয়ে ফেলা ও তার সংবিধানকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করা।

আরেকটি প্রধান কারণ হলো: বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অবহেলা করা এবং ইহুদী গোষ্ঠি, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে মৈত্রী চুক্তি পরিহার করা। যারা মুসলমানদের সম্পদ দিয়ে পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সহায়তা করার প্রতিযোগিতা করে আসছিল এবং অভ্যুত্থানকে উস্কে দেওয়ার জন্য ধর্ম ও নৈতিকতা বিবর্জিত দুর্নীতিগ্রস্ত মিডিয়া চ্যানেল খুলেছিল। আর চলচ্চিত্র নির্মাতারা, যারা তাদের প্রতারণা, ছলনা এবং মিষ্টি কথার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। ইহুদি জোট, রিয়াদের সরকার এবং তাদের উপরসাগরীয় বন্ধু রাষ্ট্রগুলো মিলে মাজলুমদের যেই রক্ত বন্যা প্রবাহিত করেছে, সেই রক্ত বন্যাই এসব অপরাধীদের পতন ঘটানোর জন্য, জনগণকে এদের গোলামী থেকে মুক্ত করার জন্য এবং মুসলিমদের পবিত্র রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য বিপ্লবীদের উৎসাহ যোগায়।

শপথ করে বলা যায়, ইহুদিদের পতনের সময় ঘনিয়ে আসছে, ইনশাআল্লাহ। এমনিভাবে তাদের মুখপাত্র ও চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরকেও প্রচণ্ড ও কঠোরভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। কেননা, এদের হাতগুলো নিরীহ মুসলিমদের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত, তাদের পকেটগুলো অবৈধ সম্পদে পরিপূর্ণ। এসব নাপাক পাপিষ্টগুলির শাস্তি এবং যারা সিসি সরকারকে যেকোন উপায়ে (হোক তা সামান্য একটি মাত্র কথার মাধ্যমে) সহায়তা করেছে, তাদের সকলের শাস্তি একই রকম হবে। সিসির বিধান যা, এদের

বিধানও তা-ই হবে। তাদের মাঝে কোন পার্থক্য করা হবে না। চাই সে মিসরের, জাজিরাতুল আরবের বা অন্য কোন অঞ্চলের অথবা কোন দল, সংগঠন বা জামাতের লোক বা একক কোন ব্যক্তি হোক।

আরো একটি মৌলিক কারণ হলো: বিপ্লবের পরে সেনাবাহিনীর মধ্যে কিছু বড় বড় অফিসারের স্বপদে অটল থাকা। এরা এমন এক শ্রেণী যাদের কাছে জনগণের কোন পাত্তাই নেই, জনতাকে নিয়ে তাদের কোন ভাবনা ও চিন্তার লেশ মাত্র নেই। তাদের চিন্তা- ভাবনায় জনসাধারণের কোন অনুভূতিই থাকে না। এরা হলো সেনাবাহিনীর মধ্যে রেখে যাওয়া পশ্চিমাদের নির্বাচিত এজেন্ডা। অথচ তাদেরকে কেবল জনসাধারণের সেবা করার জন্য এবং তাদের ভালো-মন্দ দিক বিবেচনার জন্য লালন-পালন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ তার উল্টো। তাদের হাত আজ জনসাধারণের রক্তে রঞ্জিত হয়ে আছে। তাদের হাতে নিহত জনগণের রক্ত শ্রোতের বন্যায় নদীর প্রবাহ তৈরী হয়েছে। এতগুলো ন্যাক্কারজনক কাজ করার পরেও গণতন্ত্রবাদীদের চোখে সামান্যতম পানি নেই এবং তাদের এসব জঘন্য কাজের কারণে লজ্জাশীলতা বলতেও কিছুই নেই। তাই বিপ্লবীদের জন্য আবশ্যক হলো: তারা যেন তাদের শরয়ী বিচারালয়ে এসব জঘন্য মানবতা ও মানব হত্যাকারীদের বিচার করে এবং কোন আবেদন ও প্রত্যাহর ছাড়াই যথাপোযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করে। কারণ জনগণ কখনো তাদের কাছ থেকে ধ্বংসযজ্ঞ, দুঃখ-দুর্দশা, ধোঁকা, খেয়ানত ও নিকৃষ্ট চরিত্র ছাড়া আর কিছুই পায়নি।

আমি আশা করি অভ্যুত্থানের বিপক্ষে বর্তমান বিপ্লবের প্রজ্বলন এই পাঠ থেকে শিক্ষাগ্রহন করবে। পাশাপাশি একটি বিশ্বস্ত নেতৃত্বের চারপাশে সমবেত হবে। অনর্থক খেল-তামাশাগুলির ব্যাপারে সচেতন থাকবে; যেগুলো ধর্মনিরপেক্ষতা ও উদারতাবাদের আহ্বানকারী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল। যেমন এলবারাদেই, হুসনি মোবারকের আমদানিকৃত গণতান্ত্রিক বিভিন্ন বিষয়াদি ও তার কার্টুন পার্টি এবং হামদাইন ও মুসার গানগুলো। সেসব মিডিয়া মুখপাত্রদের জিভ কেটে ফেলতে হবে, যারা তাদের ঐক্য নষ্ট করেছে। আর সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য আবশ্যকীয় কর্তব্য হলো: রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অফিস-আদালতগুলো অচল-ধ্বংস করে দিতে হবে এবং সেনাবাহিনীর মাঝে থাকা সেসব উচ্চপদস্ত অফিসাররা আছে, তাদেরকে সঠিক বিচারের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, এরা পুরো উম্মাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে।

২৫ জানুয়ারী ছিলো বিভিন্ন বিশ্বাস ও ভুল ধারণা থেকে জনগণের মুক্তির সূচনা দিবস। এমন সকল বিধি-নিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা জনগণ ভেঙ্গে দিয়েছে, যেগুলো এতদিন তাদের বিবেকের মধ্যে আড়াল হয়েছিল এবং তারা সেটি অতিক্রম করতে পারছিল না। সেদিন তারা তাদের মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের ভয়-ভীতি ও প্রভাব। মিশরীদের এবং অন্যান্যদের মন থেকে সব ভয় ও শঙ্কা দূর হয়ে তাদের মনের গভীরে অনুভূত হয়েছিলো প্রকৃত স্বভাবজাত চিন্তার। ইসলামিক গতিধারা তাদেরকে এমন এক বাস্তবতার সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে, যেই বাস্তবতা তাদের মাঝে না থাকার কারণে এতদিন তারা মুজাহিদদেরকে সাহায্য করা থেকে বিরত ছিল এবং সেসব তাগুত গোষ্ঠীর সম্মুখে প্রতিরোধ গড়তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, যারা তাদেরকে শুধুমাত্র দাওয়াতের উপকারিতার কথা বলে বলে ফেতনার গোলকধাঁধার মাঝে বন্দি করে রেখেছিল। আর তারাও সেখান থেকে বের হয়নি!! আমি আশা করছি- হয়তো এখান থেকেই একটি নতুন প্রজন্মের উদয় হবে।

জুলাইর ৩ তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত চলমান এতসব উত্থান-পতন ও প্রস্থানের মধ্য দিয়েও জনগণ সফলতার পথ ও ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে। আগামীর দিনগুলো তাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ। শত্রুরা যত বড়ই বিপদাপদ আর ট্রাজেডি ঘটাক না কেন, জনগণ যদি দৃঢ়পদে প্রতিরোধ করে, জীবনের কুরবানীতে ধৈর্য্য ধারণ করে, মু'মিনদের পথ অনুসরণ করে, তাহলে অবশ্যই তারা পশ্চিমার অনুসারী ও পূজারীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে, অভ্যুত্থানের পতন ঘটিয়ে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে মহান রাব্বুল আলামীনের নির্দেশিত পন্থায় একটি সুস্থ রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের মধ্য দিয়ে তাদের আশা ও আকাঙ্খাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারবে। তখন যেকোন পুঁজিবাদীব্যবস্থা সত্যিকারের ইসলামী শাসনব্যবস্থার সাথে নমনীয় হয়ে থাকবে।

৩রা জুলাইয়ের উত্থান ইসলামী বিপ্লব এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে ছড়ানো কিছু অপবাদের হাকিকত স্পষ্ট করে দিয়েছে। যারা এমনটি করেছে, তারা মূলত: সিসি'র ছত্রছায়ায় আশ্রিত ছিলো। তারা ইসলামের বিরোধিতা করার জন্য ওদের সাথে জোটবদ্ধ ছিল। ওরা আমাদের প্রকৃত শত্রু। তাই তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তারা হলো: تيار سلفية তথা সালাফি ধারা। তাদের অন্যতম হলো ইয়াসির বুরহামি নামের একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা। আরো আছে وتيار المداخلة তথা অনুপ্রবেশ ধারা। আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে ধ্বংস করুন। তারা দুনিয়াতে সিসি'র কাছ থেকে ভালো কোন কিছু পায়নি। ইনশাআল্লাহ, আখেরাতেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উপযুক্ত পাওনা বুঝিয়ে দিবেন।

৩রা জুলাইয়ের উত্থান কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল রেখে গেছে। সাধারণ জনগণ সেনাবাহিনীর প্রকৃত রূপ সম্পর্কে জানতে পেরেছে। যারা দীর্ঘ ৬০ বছর যাবৎ তাদেরকে শোষণ, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন এবং তাদেরকে বশীভূত করে রেখেছে। এসবের মধ্য দিয়ে জনগণ অনুধাবন করেছে যে, কার বিরুদ্ধে তাদের পরবর্তী বিদ্রোহ হবে? তারা ২৫ জানুয়ারীর নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পারে এবং সতর্ক হয়। ইনশাআল্লাহ, এর পুনরাবৃত্তি দ্বিতীয়বার হবে না। জনগণ উত্থানকারীদের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হয়েছে যে, তারা কিভাবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলোতে প্রভাব বিস্তার করে। এগুলো এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাঠ, যেগুলো অভিজ্ঞতা অর্জন করার আগ পর্যন্ত কাউকে বলে বুঝানো সম্ভব না। বিশেষ করে তারা এই বিষয়টি বুঝতে পেরেছে যে, এসব সেনাবাহিনী তাদের রক্ত নিয়ে কতটা সময় ধরে খেয়ানত করে আসছে।

প্রেসিডেন্ট মুরসিকে অপহরণের পর ইসলামী বিপ্লবীদের ও জনসাধারণের মাঝে একটি শক্তিশালী জোট তৈরী হয়েছিল। যেমনিভাবে এই আগ্রাসনের মোকাবিলা করার জন্য ইসলামী বিপ্লবকামী দলগুলোর পরস্পরের মাঝে এক ধরণের সম্প্রীতি তৈরী হয়েছিল। যা তাদের কেউ কখনো ছেড়ে দেয়নি।

তাদের পারস্পরিক এই প্রতিক্রিয়া ও মিলিত হওয়ার মাধ্যমে যদি সকলের মাঝে সমন্বয়সাধন করা সম্ভব হয়, তাহলে আমি আশাবাদি যে, ইসলামী বিপ্লবকামী দলগুলোর মাঝেও অচিরেই সামঞ্জস্যতা তৈরী হয়ে যাবে। যার ফলে তাদের মাঝে বিদ্যমান সকল মতানৈক্য ও পরিবর্তনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয়ে যাবে। তাই জিহাদী বিপ্লবের পরিবেশ জেল ও বন্দিত্বের জীবন থেকেও অধিক ভালো ও গতিময়। আল্লাহ তা'আলাই তাওফিকদাতা।

আলোচনা শেষ করার পূর্বক্ষণে আমি ইঙ্গিত করবো মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামের সাথে বিশ্বশক্তির চলমান লড়াইয়ের প্রতি। তারা ইসলাম এবং মুসলিমদেরকে একটি দেহের মত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত মনে করে।

সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা, ইসরাইল ও ন্যাটো জোটের চলমান যুদ্ধসমুহের মাধ্যমে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। আর যেসব যুদ্ধ অতি শীঘ্রই সংঘটিত হবে, সেগুলোর কারণে মুসলিম উম্মাহ সত্যিকারার্থেই এক বিনাশী হামলার মুখোমুখি হতে যাচ্ছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে, বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন সময়ে তারা তাদের আক্রমণ চালিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও চালাবে। তারা অনেক আগে থেকে অদ্যবদি পর্যন্ত আপনরুপে পূর্ণ শক্তির সাথে হামলা করে আসছে। আর মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে এসব আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দায়িত্ব স্বয়ং মুসলিম উম্মাহকে এবং উম্মাহর সিংহ সন্তানদেরকে নিতে হবে। কারণ বর্তমানে আমাদের দেশের শাসনব্যবস্থা, রাষ্ট্র কাঠামো এবং বিচারব্যবস্থা এই সব কিছুই আমাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাদের যুদ্ধের অগ্রবর্তী বাহিনী। সবগুলো মুসলিম শাসকের অবস্থা এমনই। পশ্চিমারা আমাদের শাসকদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে কাজে লাগাচ্ছে যে, পশ্চিমাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা এসব শাসকশ্রেণী ভেঙ্গে দিচ্ছে। এরা মূলত: আমাদের বিরুদ্ধে প্রসারিত পশ্চিমাদের কালো হাত। পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য হলো, এদের মাধ্যমেই তারা আমাদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণ অবধারিত করে তুলবে।

সম্ভাব্য যে কোন উপায়ে এসব ব্যবস্থাকে অপসারণ করতে হবে এবং প্রথমে আমাদের দ্বীন নিয়ে তাদের অপরাধের পাওনা কড়া গন্ডায় উসুল করতে হবে। কেননা, তা এমন একটি তথ্যসূত্র, যা তারা কেবল মানুষের হৃদয় থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্যই প্ররোচিত হয়ে করেছিল। দ্বিতীয়ত: তারা দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও অর্থনীতিতে ক্ষতি, স্বদেশ, দ্বীন ও জাতির সাথে গাদ্দারী, ভিনদেশী দুশমনকে সহয়যোগিতা এবং হত্যা, চুরি ও বিশৃঙ্খলার মত অপরাধ করে

মুসলিম উম্মাহর যে রক্ত চোষণ করেছে, তারও পাওনা চুকিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিষয় আজ আমাদের বাহিরের শত্রুর অধীনে চলে গেছে। যার দরুন স্বদেশের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা অনিশ্চিত হয়ে গেছে।

মিশরকে স্বাধীন করার জন্য, শাসনব্যবস্থাকে পরিপূর্ণরূপে পরিবর্তন করার জন্য এবং মিশরের স্থায়ী ও যোগ্য নেতৃত্য গঠন করার জন্য মিশরের করণীয় হলো: তিন ক্ষেত্রবিশিষ্ট একটি বিপ্লবের মাঠ প্রস্তুত করা। প্রথম ক্ষেত্র হচ্ছে: দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সেগুলোর পরিবর্তন সংক্রান্ত। দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে: আঞ্চলিক হস্তক্ষেপ। তৃতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে: আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ। যখন এই বিষয়গুলো নিশ্চিত হয়ে যাবে, তখন আবশ্যিকভাবে দু'টি পথ সামনে চলে আসবে। **এক:** হয়তো বিপ্লবকে পূর্ণাঙ্গতা দান করা। **দুই:** না হয় বিপ্লবকে এভাবেই সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। প্রথমটি হবে আঞ্চলিক হস্তক্ষেপের মোকাবেলায়, আর দ্বিতীয়টি আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ বা বিপ্লবের ধরণ, পদ্ধতি, উপকরণ সম্পর্কে আমি কোন কথা বলবো না। কারণ, এর ধরণ যেকোন বিপ্লব বা যুদ্ধের ধরণ, সময় ও শত্রুর আক্রমণের ধরণই বলে দেয়। যুদ্ধ বা বিপ্লব আলাদা একটি শাস্ত্র, শিল্প, জ্ঞান। এগুলো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অনেক কারণেই হয়ে থাকে। আর এই যুদ্ধ বা বিপ্লব কিভাবে, কোথায়, কখন এবং কার বিরুদ্ধে করা হবে? এ বিষয়ে পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

আমি আমার এই আলোচনার সারকথা তিন বাক্যে সীমাবদ্ধ রাখছি। যথা-

**এক.** সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া কোন শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

**দুই.** সশস্ত্র মোকাবেলা ছাড়া কোন শক্তি বা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আত্মসমর্পন করানো আদৌ সম্ভব নয়।

**তিন.** যেমনিভাবে বিপ্লবের জন্য প্রতিরোধ যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া ছাড়া শাসনব্যবস্থাটি পরাজিত হওয়ার আদৌ সম্ভাবনাও থাকে না।

***

*নোট: হুসনি মোবারক কারাগার থেকে বের হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে আমি এই আলোচনা শেষ করলাম। আগামীতে আমাদের আলোচনা হবে জাতীয় জাগরণ সম্পর্কে। এরপর প্রতিরোধ আন্দোলন সম্পর্কে। সবশেষে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে, ইনশাআল্লাহ।*

**১৪ শাউয়াল, ১৪৩৪ হিজরী**

**২২ আগস্ট, ২০১৩ ইংরেজী**